শুকতারা

দশম বর্ষ
তৃতীয় সংখ্যা
বৈশাখ ১৩৬৪

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান করেছেন : মোঃ রোকনুজ্জামান রনি

এডিট করেছেন : রনি ও সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

"শুকতারা" পড়ছো যে সব ভাইবোনেরা—

কাগজ

যে কত দামী তা' তোমরা জানো। সাহিত্য, ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র ভোজ এই কাগজের পাতায় ক'রে পরিবেশন ক'রেছেন বিশ্বের জ্ঞানী গুণীরা তোমাদের কাছে। এই কাগজের সম্মান তোমরাই রাখবে—তার সত্যিকারের সদ্ব্যবহার দ্বারা, অর্থাৎ লেখাপড়ায়।

●

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স

(প্রাইভেট) লিমিটেড

কাগজ, বোর্ড, ছাপার কালি, লেখন সামগ্রী

ইত্যাদি বিক্রেতা

"রঘুনাথ বিল্ডিংস্"—৩২-বি, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-১

●

—শাখা—

কলিকাতার সর্ব্বত্র, উত্তর প্রদেশ ও আসাম

ফোন—ব্যাঙ্ক ৪৯৯১ | পোঃ বক্স—১৬২ | তার—"নোটপেপার"

"শুকতারা"

Approved by the Text-Book Committee, Bihar, as a Supplementary Reader in Secondary and Primary Schools (Children's Monthly Journal)
(Vide Patna Gazette, 30th Dec., 1950).

সূচীপত্র—বৈশাখ, ১৩৬৪

	বিষয়	লেখক লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	সঙ্কল্প (চিত্রের সাহায্যে সাহিত্য-প্রতিযোগিতা)		মুখপত্র
২।	ছোটর মাঝেই বড়র স্বপন (কবিতা)	শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ	১৬৯
৩।	একটি ছোট্ট ছেলের গল্প (গল্প)	অশোক মুখোপাধ্যায়	১৭১
৪।	ইতিহাসের পাতা (লাক্ষ্মৌর) (ঐতিহাসিক প্রবন্ধ)	অমরনাথ রায়	১৭৬
৫।	আব্দার (কবিতা)	শামসুদ্দীন	১৮১
৬।	হারানো মেয়ে (গল্প)	কুমারী অঞ্জলি চন্দ্র	১৮২
৭।	গল্প হলেও সত্যি	শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১৮৬
৮।	স্মৃতির দু'চার পাতা (গল্প)	মুরারিমোহন বিট্	১৮৭
৯।	প্যালার কীর্ত্তি (কবিতা)	বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৫
১০।	শিল্পীর পুরস্কার (গল্প)	শ্রীনকুল মুখার্জ্জী	১৯৬
১১।	বিপদের মুখোমুখি (শিকার-কাহিনী)	শ্রী প্রবীরকুমার	২০০
১২।	সান্ত্বনা (কবিতা)	শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ	২০৫
১৩।	ইস্কাবনের টেক্কা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা	২০৭
১৪।	আশা-পরী (বিদেশী রূপকথা)	দীপেন সেনগুপ্ত	২১৪
১৫।	খোকার চিঠি (কবিতা)	তারিণীচরণ বসু	২২০
১৬।	দুষ্ট শিকারী (বৌদ্ধ গল্প)	শ্রীসুলতা কর	২২১
১৭।	ইংরেজী মাসের নাম (প্রবন্ধ)	শ্রীবিজনকুমার চৌধুরী	২২৫
১৮।	রেলগাড়ী (কবিতা)	শ্রীপ্রভাকর মাঝি	২২৭
১৯।	স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম সেনাপতি (চিত্রে-জীবনী)	...	২২৮
২০।	হরিসাধন সাহিত্য-প্রতিযোগিতা (ঘোষণা)	...	২৩১
২১।	আরও মজার ঘটনা (হাস্যকৌতুক)	'যাদুসম্রাট্' পি. সি. সরকার	২৩১
২২।	সুদূরের বাণী	রবার্ট ব্রাউনিং	২৩৩
২৩।	চাষী (কবিতা)	শ্রীনীলরতন দাশ	২৩৪
২৪।	সোনার ভারত (চিত্রে ইতিহাস)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার	২৩৫
২৫।	ব্যায়ামবীর (কবিতা)	সুনির্ম্মল বসু	২৩৮
২৬।	খেলার আসর (খেলাধূলা)	শ্রীসাংবাদিক	২৩৯
২৭।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি)	...	২৪১
২৮।	দাদুমণির চিঠি	...	২৪৩

পাদপূরণ

পান খাওয়া ভালো	১৭০, ১৯৯
গল্প হয়ে শোনো	১৮০

পাদপূরণ

ব্যায়াম বিজ্ঞানী	২১৩
কয়লা পুড়লে এত কমে যায় কেন ?	২১৯
মণিমুক্তা	২২৪

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER (Suktara) To BE PUBLISHED IN THE FIRST ISSUE EVERY YEAR AFTER THE LAST DAY OF FEBRUARY

FORM IV

1. Place of Publication—22/5B, Jhamapooker Lane, Calcutta-9.
2. Periodicity of its publication—Once in a Month.
3. Printer's Name—S. C. Mazumdar.
   Nationality—Indian.
   Address—24, Jhamapooker Lane, Calcutta-9.
4. Publisher's Name—S. C. Mazumdar.
   Nationality—Indian.
   Address—24, Jhamapooker Lane, Calcutta-9.
5. Editor's Name—Madhusudan Mazumdar.
   Nationality—Indian.
   Address—21/1, Jhamapooker Lane, Calcutta-9.
6. Name and address of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital—Dev Sahitya Kutir Private Ltd.,
   21, Jhamapooker Lane, Calcutta-9.

I, Subodh Chandra Mazumdar, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. S. C. Mazumdar
Signature of Publisher.

Date—1. 3. 57.

"শুকতারা"র নিয়মাবলী

১। "শুকতারা"র চাঁদার হার (সডাক): বার্ষিক—৪৲; ষাণ্মাসিক—২৷৷০ ও প্রতি সংখ্যা ৵০। নমুনা-সংখ্যার জন্য ।১০ আনার ডাক-টিকেট বা মণি-অর্ডার যোগে ।১০ আনা পাঠাইতে হয়।

২। ফাল্গুন মাস হইতে "শুকতারা"র বর্ষ আরম্ভ। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া, ফাল্গুন অথবা অন্য যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

৩। প্রতি মাসে ১লা তারিখের মধ্যেই পত্রিকা Ordinary Post-এ পাঠান হয়। ৫ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে, স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের দ্বারা পত্রিকা না পাইবার বিষয়ে সুপারিশ করাইয়া চিঠি লিখিলে, Certificate of Postingএ পুনরায় পাঠান হয়।

৪। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে, ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৫। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের গল্প, কবিতা, ফটো অথবা তাঁহাদের আঁকা ছবিও "শুকতারা"য় প্রকাশের জন্য বিবেচনা করা হয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকেট না পাঠাইলে ফলাফল জানান কিংবা অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান সম্ভব হয় না। বিভিন্ন বিভাগের লেখা আলাদাভাবে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া ও নকল রাখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৬। ধাঁধার উত্তর ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের অফিসে পৌছান দরকার।

"শুকতারা"-বিভাগ
২১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

সম্পাদক,
"শুকতারা"

সঙ্কল্প

● হরিসাধন সাহিত্য-প্রতিযোগিতা ●

বিষয়বস্তু ঃ—

এই ছবিটির সাহায্যে ও নিম্নের সঙ্কল্প অনুসরণ করিয়া একটি গল্প লিখিতে হইবে।

নিয়মাবলী ২৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সঙ্কল্প

আমার সামনে এই আল্‌প্‌স…শীতের আল্‌প্‌স্‌… বরফে তার অলি-গলি সমস্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তা আমি জানি। তবুও এই আল্‌প্‌স্‌ উল্লঙ্ঘন করে আমাকে যেতে হবে। আমার পথ-চলায় কেউ বাধা দিতে পারবে না —মানুষও নয়, প্রকৃতিও নয়। তোমরা আমার সামনে এ-কথা বলো না যে, 'অসম্ভব'। আমার অভিধানে 'অসম্ভব' বলে কোন কথা নেই। শুধু যারা বোকা, যারা অলস, যারা কিছু করবে না, তাদের অভিধানেই ঐ কথাটা পাওয়া যায়। থাকুক আল্‌প্‌স্‌ তার মাথা উঁচু করে, পড়ুক তুষারের পর্দা পথ-ঘাট আটক করে,—নেপোলিয়ান আল্‌প্‌স্‌ অতিক্রম করে যাবেই।

—নেপোলিয়ান

শুকতারা

দশম বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা • ১৩৬৪, বৈশাখ

ছোটর মাঝেই বড়র স্বপন

—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

"ছোট্ট আমায় ভাবে সবাই, কিন্তু তা তো নয় ;
বড় আমি—মস্ত বড়, যেমন সবাই হয় !
আমার কথা কেউ শোনে না,
মনের ব্যথা কেউ বোঝে না,
কথায় কথায় দেখায় জুজু, দৈত্য-দানোর ভয় ;
কানকাটা আর ছেলেধরা"—ছোট্ট খোকোন কয়।

"ছোট্ট তোরে বলুক সবাই, যায় কি তাতে এসে ?
ইচ্ছা হয়ে ছিলি যে তুই আমার মনের দেশে।
তুই যে আমার নয়ন মণি
সাতরাজা ধন—রতনখনি,
কতই পূজা তোর করেছি মাটির পুতুল বেশে ;
আয় বাপি আয় কোলে আমার"—বলেন মাতা হেসে।

"ছোটর মাঝেই বড়র স্বপন ঘুমিয়ে থাকে জানি,
আজ যে ছোট, কাল সে বড়—চিরন্তনীর বাণী।
দেশ-মনীষী আজকে যাঁরা—
সবাই ছোট ছিলেন তাঁরা,
তাঁদেরও যে বড়রা আগে নিত না কাছে টানি"...
এই বারতা শুকতারা আজ খোকারে দেয় আনি।

● জেনে রাখা ভালো

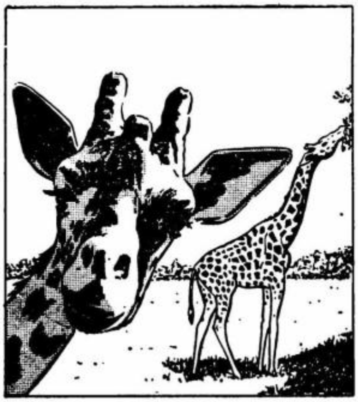

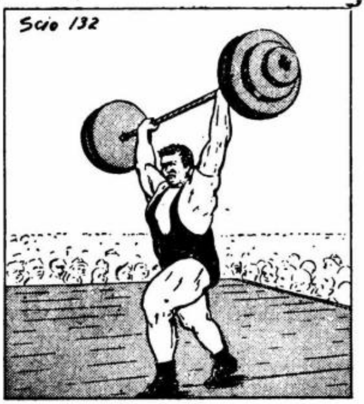

১নং চিত্র। জিরাফের ডাক শুনেছ কোন দিন? লোকে বলে জিরাফ ডাকতে পারে না। আসলে কিন্তু ব্যাপা তা নয়—অন্য সব প্রাণীর মতই জিরাফও ডাকতে পারে। তার গলা দিয়ে তিন রকম ডাক বেরোয়।

২নং চিত্র। আমেরিকার সুদক্ষ খেলোয়াড় পল্ এণ্ডারসন। তার বয়স মাত্র বাইশ বছর। লোকে বলে সে পৃথি সবচেয়ে শক্তিশালী লোক। পল প্রায় ৪৪ মণ ওজন তুলে দুবেলা ব্যায়াম করে।

৩নং চিত্র। আমরা বহু রকমের ফুল দেখেছি—তোমরা ছবি দেখে আশ্চর্য্য হবে। জাভায় এই লিলি ফুলটি দেখ মানুষের সমান উঁচু।

একটি ছোট্ট ছেলের গল্প

—অশোক মুখোপাধ্যায়

ছাতের ওপর বসে বইপত্র নাড়াচাড়া করছে

আমাদের বাড়ীর ছাদে উঠে ডান দিকে তাকালেই যে জীর্ণ ছোট্ট বাড়ীটা চোখে পড়ে, তার ছাতে প্রায়ই আমি একটি ছেলেকে বসে থাকতে দেখি। ছেলেটির বয়েস তের কি চৌদ্দ। কিন্তু বয়সের চাইতে ওকে আরও ছোট দেখায়।

বড্ড রোগা ঐ ছেলেটি। ওর রোগা ফর্সা মুখখানার ওপর ভাসা ভাসা বড় বড় দুটি চোখ—ওর দিকে তাকালেই কেমন যেন একটা মায়া হয়।

ছেলেটি ছাতে বসে অত কি লেখাপড়া করে, তা জানবার আমার খুব আগ্রহ ছিল। ওর মত বয়সের ছেলেরা গলির মোড়ে মার্বেল, ডাংগুলি খেলে; ঘুড়ি ওড়ায় নয়তো ইটের উইকেট তৈরী ক'রে ক্রিকেট খেলে। কিন্তু ওকে কখনও দেখতে পাই না সে দলে। যখন স্কুলে না থাকে, তখন রেলিঙের ধারে এসে দাঁড়ালেই ওকে দেখতে পাই—ছাতের ওপর বসে কি সব বইপত্র, খাতাটাতা নাড়াচাড়া করছে।

একদিন বড় ইচ্ছে হোল, ওর সাথে আলাপ করি। তখন বিকেল বেলা। ছাতের কিনারে গিয়ে রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে ডাকলাম, —"খোকা, শোন!" ছেলেটি চমকে ফিরে তাকাল। ডাগর দুচোখে ওর রাজ্যের

বিস্ময়। বিকেলের রাঙা আলো আর আম গাছটার ঝাপসা আলো-আঁধারিতে ঐ ভাঙা ছাতটিতে ওকে ঠিক একটি দেবকুমারের মত দেখাচ্ছিল।

—"আমায় ডাকছেন ?" খানিকক্ষণ পর ও জিগ্‌গেস করল।

—"হাঁ।" আমি উত্তর দিলাম।

—"কেন ?" ও খুব অবাক হয়ে গেছে।

—"এই এমনি, গল্প করবার জন্যে আর কি। পাশাপাশি বাড়ীতে থাকি, রোজই তোমাকে দেখতে পাই ছাতে, তাই আলাপ করবার ইচ্ছে হোল।"

—"ও!" ছোট্ট জবাব দিল ও আর তাতেই বুঝলাম, ছেলেটি বড্ড মুখচোরা।

—"আচ্ছা বলতো, তুমি ছাতে বসে অত কি লেখাপড়া কর ?"

ছেলেটি লজ্জায় রাঙিয়ে উঠল। বলল—"ও কিছু নয়, বসে বসে···বসে বসে—"

কি যে সে করে বসে বসে, সঙ্কোচে সে কথা আর বলে উঠতে পারল না। মুখের কথা তার মুখেই মিলিয়ে গেল।

ছেলেটির সাথে কিছুদিনের মধ্যেই আমার বেশ আলাপ হয়ে গেল। ওর নাম প্রদীপ। ক্লাস এইটে পড়ে। এটুকুই সে আমাকে বলেছে তার নিজের সম্বন্ধে। কিন্তু আরও কিছু জানতে পেরেছি আমি। অবশ্য ওর কাছ থেকে নয়—আমার ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে। পড়াশুনায় নাকি ও অসাধারণ মেধাবী। ক্লাসের ফার্ষ্ট প্লেসটি বরাবর ওর জন্য বাঁধা। ছেলেটির আর একটি গুণ আছে। বেশ গল্প লিখতে পারে ; এবং এ জন্যেই ওকে আমি রোজ বিকেলে ছাতে বসে থাকতে দেখি।

ও যে গল্প লেখে, তাও নিজে আমাকে বলেনি কোনদিন। সেদিন নিতান্ত আকস্মিকভাবেই তা জেনেছিলাম। অন্যান্য চিঠি-পত্রের সাথে পিয়ন দিয়ে গেল একটা বুকপোষ্ট্ চিঠি। অবাক হয়ে ভাবলাম, এটা আবার কোত্থেকে এল! ওপরে কার নাম লেখা আছে, কোথা থেকে এসেছে, সেসব কিছু না দেখেই খুলে ফেললাম চিঠিটা। পড়ে আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। দু'লাইনের ছোট্ট একটি ছাপানো চিঠি :—

মহাশয়,

আপনার গল্পটি অমনোনীত হয়েছে। তাই ফেরৎ পাঠালাম।

ইতি,

সম্পাদক, কিশোর-পত্র।

সঙ্গে একটি লেখা গল্প। নাম 'শিশির'। পাশে ছোট ছোট অক্ষরে লেখকের নাম লেখা রয়েছে—প্রদীপ কুমার ঘটক। বুঝলাম, পিয়ন ভুল ক'রে চিঠিটা আমাদের বাড়ী দিয়ে গেছে।

খুব কৌতূহল হোল। কি গল্প আবার লিখল প্রদীপ! এক নিশ্বাসে প'ড়ে

পড়লাম সমস্ত গল্পটা। বেশ লাগল। যদিও কাঁচা লেখা, উচ্ছ্বাসে ভরা, তা হলেও লেখার মধ্যে সুন্দর একটা ষ্টাইল আছে। ভাষাও বেশ ঝরঝরে। আশ্চর্য্য হ'লাম। ওর মত একটি ছোট ছেলের কাছ থেকে এ ধরণের লেখা আশা করা যায় না। গল্পটিকে আর একটু সুসংবদ্ধ করলে নিশ্চয় মনোনীত হ'ত। আর সম্পাদক তো জানেন না যে, এর লেখক চৌদ্দ বছর বয়সের একটি ছেলে!

ভাইকে দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়ে দিলাম ওদের বাড়ী। বললাম, জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে আসতে। চিঠিটা আমরা দেখেছি, সে যেন না জানতে পারে। জানলে লজ্জা পাবে। বিকেলে দেখা হতেই ওকে বললাম,—"প্রদীপ, তোমার গল্পের খাতাটি দেবে—পড়ব?"

—"আপনাকে কে বললে আমি গল্প লিখি?"

হকচকিয়ে গেলাম। কি উত্তর দিই? ঐ চিঠিটা দেখে জেনেছি, তা কিছুতেই বলা যেতে পারে না। আমতা আমতা ক'রে বললাম,—"এই কে যেন বলল। নামটা—নামটা মনে পড়ছে না তো!"

কিছুক্ষণ এড়াবার চেষ্টা করল ও। কিন্তু আমিও ছাড়বার পাত্র নই। শেষে এনে দিল একটা খাতা। বলল,—"একটু শুদ্ধ ক'রে দেবেন—হ্যাঁ!"

ছেঁড়া ছেঁড়া ছোটবড় নানারকম কাগজ দিয়ে খাতাটি তৈরী। পৃথিবীতে যে এতরকমের কাগজ আছে, খাতাটা দেখবার আগে পর্য্যন্ত বোধ করি সে ধারণা ছিল না। বেশীর ভাগ কাগজই এক পৃষ্ঠা টাইপ করা। তার মাঝে মাঝে পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। সবই গল্প। নানারকম ছোটখাট ঘটনা নিয়ে লেখা। খাতাটার মধ্যে বেশ জমে গিয়েছিলাম। পড়া শেষ হ'লে ছাতে গিয়ে ওকে ডাকলাম ফিরিয়ে দেবার জন্য।

প্রদীপ ফিরে তাকাল। তারপর ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে পা টিপে টিপে রেলিঙের ধারে এসে ফিস ফিস ক'রে বলল,—"আস্তে—আস্তে।"

—"কেন, কি হোল আবার?" আমিও কিছু না বুঝতে পেরে ওরই মত ফিসফিস ক'রে জিগ্‌গেস করলাম।

—"মা খুব রেগে গেছে। বকছে আমায়।"

—"কেন?"

—"স্কুলের পিয়ন এইমাত্র হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার প্রগ্রেস-রিপোর্ট দিয়ে গেছে। ফার্ষ্ট হতে পারিনি বলে এতদিন বাড়ীতে নম্বর বলিনি। আজ প্রগ্রেস রিপোর্ট দেখে মা ভয়ানক রেগে গেছে। বলছে, আমি পড়াশুনো করি না আর বসে বসে আজে-বাজে জিনিস লিখে সময় নষ্ট করি বলেই নাকি ফার্ষ্ট হ'তে পারিনি।"

—"সত্যিই তো। পড়াশুনোয় তোমার তো হেলা করা উচিত নয় মোটেই। ফার্ষ্ট হ'তে না পারলে ফ্রী-শিপ কাটা যাবে যে! নিজেদের অবস্থা তো বোঝো।"

—"কি করব, বলুন! একটাও বই নেই যে। এর থেকে ওর থেকে চেয়ে আর কত পড়া যায়।"

এরপর আর কি বলি। ওর বাবা যা মাইনে পান, তাতে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াই প্রায় ওদের হয়ে ওঠে না। বই কিনে দেবেন কি ক'রে! নেহাৎ ফার্ষ্ট হচ্ছে বলেই মাইনেটা দিতে হচ্ছে না। তাই পড়াটা চলছে। না হ'লে হয়তো তাও বন্ধ হ'য়ে যেত।

কয়েকদিন পর প্রদীপ আমার কাছে একটা ছক-কাটা কাগজ নিয়ে এল। দেখেই বুঝলাম, একটা লটারীর সমাধান। প্রদীপ বলল,—"আজই এটা পাঠিয়ে দেব। সব কয়টা শব্দ মিলিয়েছি। নিশ্চয় প্রাইজটা পেয়ে যাব। বাস্, তারপর আর দেখে কে? একদিনেই অনেক টাকা হ'য়ে যাবে আমাদের।"

মনে মনে হাসলাম। ও ভেবেছে, শুদ্ধ হলেই বুঝি প্রাইজ পাওয়া যায়। হেসে বললাম,—"ওসব পাগ্‌লামী বাদ দাও। এণ্ট্রী-ফীটাই নষ্ট হবে শুধু, আর লাভ হবে না।"

—"কেন লাভ হবে না?" প্রদীপ তর্ক ক'রে বোঝাতে চাইল প্রাইজ তার না পাবার কোন কারণই নেই।—"সব কটা শব্দ মিলে গেছে—আর কি চাই?"

ওকে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করলাম যে, শুদ্ধ হ'লেই প্রাইজ দেয় না। একমাত্র ওদের সাথে মিললেই প্রাইজ দেবে।

কিন্তু প্রদীপ আমার কথা শুনল না। আট আনা এণ্ট্রী-ফী যোগাড় ক'রে পাঠিয়ে দিল সমাধানটা। বেশী বারণ করতে আমার কষ্ট হোল। অবোধ ছেলে, ভেবেছে লটারীতে কিছু টাকা পেয়ে তাদের অবস্থা ভালো ক'রে ফেলবে।

লটারীতে প্রাইজ যে সে পেল না, সেকথা বোধ করি বলাই বাহুল্য।

এর কিছুদিন পর একটা চিঠি সে পাড়ার সবাইকে দেখিয়ে বেড়াল। তার একটা গল্প ছাপা হচ্ছে—সম্পাদক নাকি জানিয়েছেন, মনোনীত হয়েছে। আমাকেও ও দেখাল চিঠিটা। বললাম,—"বাস্, এবার তো তুমি বিখ্যাত লোক হ'য়ে গেলে। ছাপার অক্ষরে বেরোচ্ছে তোমার লেখা—আর কি চাই!"

—"ছাপার অক্ষরে বেরুক না বেরুক, টাকাটা পেলেই আমার হোল। আর কিছু চাই না।"

—"টাকা, কিসের টাকা?" অবাক হ'য়ে আমি জিগ্‌গেস করলাম।

—"বা রে, গল্প ছাপা হ'লে টাকা দেবে না বুঝি?"

হঠাৎ যেন একটা হোঁচট খেলাম আমি। তারপরই ফেললাম একটা দীর্ঘশ্বাস। ছেলেটা টাকা টাকা ক'রে পাগল হয়ে উঠেছে। কি ক'রে কিছু টাকা রোজগার ক'রে সংসারে সাহায্য করতে পারবে—এই ওর একমাত্র চিন্তা। গল্প লেখার পেছনেও সেই একই উদ্দেশ্য।

বললাম,—"টাকা তো তোমাকে দেবে না ভাই। নাম-করা লেখক না হ'লে কি টাকা দেয়?"

—"টাকা দেবে না?" একেবারে যেন নিবে গেল ও। চিঠিটা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে চ'লে গেল।

সেদিন ওদের বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। প্রদীপ এবারও ফার্ষ্ট হ'তে পারেনি। এইমাত্র ওর ক্লাসের একটি ছেলে একথা ব'লে গেল ওদের বাড়ী। প্রদীপ এখনও ফিরে আসেনি স্কুল থেকে। দোতালার জানালায় দাঁড়িয়ে শুনতে পাচ্ছি, ওর মা অবিশ্রান্তভাবে ব'কে চলেছেন ওর উদ্দেশ্যে। এমন সময় ওদের বাড়ীর দরজায় কড়া নড়ে উঠলো ঠক্ ঠক্ ক'রে। ওপর থেকে দেখতে পেলাম, কড়া নাড়ছে প্রদীপ। হাতে ওর কি একটা মাসিক-পত্রিকা।

একটা ভীষণ মুহূর্ত্তের জন্য তৈরী হয়ে আছি। মা দরজা খুলে দিলেন। দরজা খুলে সামনে প্রদীপকে দেখেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। একেই তো ফার্ষ্ট হ'তে পারেনি, তার ওপর আবার হাতে ওর কি একটা বাইরের বই। স্যাৎ ক'রে বিদ্যুৎবেগে বইটা ছিনিয়ে নিলেন তিনি প্রদীপের হাত থেকে। তারপর ফাৎ ফাৎ ক'রে ছিঁড়ে ফেললেন তিন টুকরো ক'রে।

প্রদীপ ষ্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। বইটা ছিঁড়তেই সে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল—"মা, ছিঁড়ো না, ছিঁড়ো না—ওতে যে আমার লেখা গল্প ছাপা হয়েছে!"

কিন্তু ততক্ষণে ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলো মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে।

চোখের জল চাপতে চাপতে প্রদীপ ঢুকে গেল ঘরের ভেতর। শুধু আমি ওপর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। ওর মা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে। আস্তে আস্তে তাঁর মুখ-চোখ শান্ত হয়ে এল। নীচু হয়ে তিনি কুড়িয়ে নিলেন কাগজের টুকরোগুলো। তারপর সেগুলোকে পাশাপাশি বসিয়ে পড়তে চেষ্টা করলেন লেখাটা। দূর থেকে দেখতে না পেলেও বেশ বুঝতে পারলাম, তাঁর চোখের ফোঁটা ফোঁটা জল ভিজিয়ে দিচ্ছে কাগজের সেই ছেঁড়া টুকরোগুলোকে।

---

* ইতিহাসের পাতা (লাক্সোর)

—অমরনাথ রায়

চল, আজ সবাই মিলে পিরামিডের দেশে বেড়িয়ে আসি। পিরামিডের দেশে যেতে হলে ভারতবর্ষ ছেড়ে আমাদের সোজা চলে যেতে হবে সুদূর পশ্চিমে। যেতে যেতে পথে পড়বে আফ্রিকা মহাদেশ—যে মহাদেশের মাঝে আছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মরুভূমি—সাহারা। এই সাহারা মরুভূমির উত্তর-পূব দিকে নীলনদের অববাহিকায় পিরামিডের দেশ—মিশর। 'মিশর' নামটা দিয়েছে আরব দেশের লোকেরা, আর গ্রীক দেশের লোকেরা নাম দিয়েছে 'ঈজিপ্ট'। দেশটার মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে প্রায় চারশো মাইল লম্বা নীলনদ। নীলনদের ছ'ধারে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় সাড়ে সাতশো মাইল জুড়ে সাপের মত আঁকা-বাঁকা এই মিশর দেশ।

সাহারা মরুভূমি বিরাট দৈত্যের মত হাঁ ক'রে বসে আছে—যেন সে সারা মিশর দেশটাকেই গ্রাস করতে চায়। কিন্তু সে সুযোগ আর তার আসছে না। বাদ সাধছে নীলনদ। প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে নীলনদে ডাকে বান। বানের জল নদীর ছ'কূল ছাপিয়ে বেশ কিছুদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় একশোদিন আশেপাশের বিস্তৃত এলাকা বন্যার জলে ডুবে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে ঐ জল যায় নেমে! কিন্তু যে পলিমাটি সে ফেলে যায় মিশরের বুকে, সেই পলিমাটিই ফলায় সোনালী ফসল। প্রতিবছর যদি এমনিভাবে নীলনদে বান না ডাকতো, তবে মিশর অনেকদিন আগেই হারিয়ে যেত সর্ব্বগ্রাসী সাহারার বুকে। তাইতো পৃথিবীর আদি ঐতিহাসিক, গ্রীক-পণ্ডিত হেরোডোটাস বলেছেন—মিশর হোল নীলনদের দান। আবার এই দেশের মধ্যেই সুয়েজখাল। প্রায় একশো ছ' মাইল লম্বা এই সুয়েজখাল যোগ করেছে ভূমধ্যসাগর আর লোহিত সাগরকে। আর এই খাল কাটার ফলে ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসার পথ তিন হাজার মাইল গেছে কমে।

মিশরের চিত্রিত পাত্র

মিশর হলো পৃথিবীর মধ্যে একটা প্রাচানতম সভ্য দেশ। পৃথিবীর ইতিহাসে মিশরীয় সভ্যতার স্থান অনেক উঁচুতে। প্রায় পাঁচহাজার বছর আগেও এ দেশটা সভ্যতায় ও সম্পদে জগতের মধ্যে ছিল শ্রেষ্ঠ। সেখানকার পিরামিড, স্ফিংস এবং থিব্‌সের ধ্বংসাবশেষ আজও মিশরের গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতিচিহ্ন বহন ক'রে চলেছে। ধ্বংসস্তূপগুলো দেখলে মনটা ব্যথায় ভরে যায়—অবাক্ হয়ে যেতে হয় মিশরের প্রাচীন শিল্পকলা ও সভ্যতার নিদর্শন দেখে।

সে প্রায় চার হাজার বছর আগেকার কথা। মিশরের দক্ষিণ দিকে একটি জেলার নাম ছিল থিব্‌স। থিব্‌সকে বলা হতো পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্মৃতিস্তম্ভময় অঞ্চল। এই অঞ্চলেরই দক্ষিণ দিকে

---
* কলিকাতার বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে।

…নদের ধারে ছিল একটা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ শহর। নাম তার লাক্সোর। আজ সেই …ক্সোরের কাহিনীই তোমাদের শোনাব।

প্রায় চার হাজার বছর আগে মিশরে দ্বাদশ রাজবংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। তাঁদের সময় মিশর ছিল একটা সমৃদ্ধিশালী দেশ। দেশের লোকেরা তখন ছিল সুখী—পরম শান্তিতে তারা বাস করতো। শুধু তাই নয়, শিল্পে ও স্থাপত্যে মিশর তখন গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। এই দ্বাদশ রাজবংশের রাজাদের মধ্যে আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তৃতীয় আমেন-হোটেপ। মিশরের সমরকুশল রাজাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

মিশরের লোকেরা রাজবাড়ীকে বলতো 'পেরো' অর্থাৎ কিনা বড়-বাড়ী। এই পেরো শব্দ থেকেই মিশরের রাজাদের উপাধি হয়েছে 'ফ্যারাও'। ফ্যারাও তৃতীয় আমেনহোটেপ মিশরে এক নূতন ধরণের স্থাপত্যের প্রবর্ত্তন করেছিলেন। সে স্থাপত্য আজও অমর হয়ে আছে আর তার প্রভাব পড়েছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্থাপত্যের ওপর। মিশরের এই সুযোগ্য ফ্যারাও-এর রাজত্বকালে যে সব মন্দির ও স্মৃতিসৌধ তৈরী করা হয়েছিল, প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের বিবরণ থেকে তার এক বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে গয়া, কাশী প্রভৃতি যেমন পবিত্র তীর্থস্থান, সেকালে লাক্সোর শহরটাও

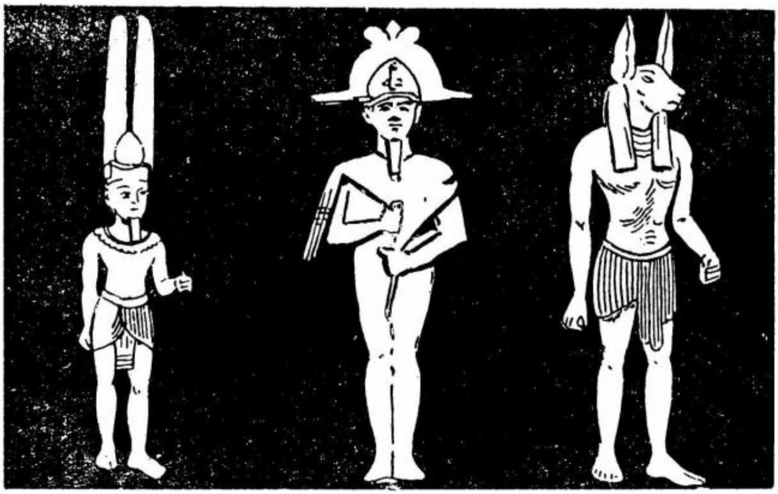

প্রাচীন মিশরের কয়েকটি দেবতার প্রতিমূর্ত্তি

ছিল মিশরবাসীদের তীর্থস্থান। সেযুগে দক্ষিণ মিশরের প্রধান দেবতা ছিলেন 'আমন'। আমন ছিলেন সূর্য্যদেবের প্রতীক। সূর্য্য থেকেই পৃথিবীর সব কিছুর যে সৃষ্টি—একথা প্রাচীন মিশরবাসীরাও জানতেন। তাঁরা ছিলেন প্রকৃতির পূজারী। তাই তাঁরা পূজা করতেন সূর্য্যদেবের প্রতীক, দেবতা আমনকে। লাক্সোরে এই আমনদেবের একটা ছোট মন্দির ছিল। মন্দিরটা ছিল সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে ভরা, মিশরীয় স্থাপত্যের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন। লাক্সোরের

ঐ সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ফ্যারাও তৃতীয় আমেনহোটেপের পূর্ব্বপুরুষ—দ্বাদশ রাজবংশের রাজারা।

লাক্সোরের উত্তরে নীলনদ থেকে কিছুদূরে—দক্ষিণে আর একটা শহর ছিল। নাম তার কার্ণাক। ফ্যারাও প্রথম থুটমোস তৈরী করেছিলেন এখানে আমনদেবের বিরাট এক মন্দির। লাক্সোর থেকে কার্ণাক হাঁটাপথে মাত্র আধঘণ্টার পথ। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে সেযুগে লাক্সোর নাকি নীলনদের ধারে একটা বেশ বড় বন্দর ছিল। আজ অবশ্য সে লাক্সোর আর নেই। নীলনদের প্রবল জলস্রোতে ধীরে ধীরে ধুয়ে মুছে যাচ্ছে আসল শহরটা। সে যাই হোক, ফ্যারাও তৃতীয় আমেনহোটেপ নাকি তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকে লাক্সোরের আমনদেবের সেই ছোট মন্দিরটাকে ভেঙ্গে তার জায়গায় বড় ক'রে এক নতুন মন্দির গড়েছিলেন। ঐ পবিত্র স্থানটার চারিদিকে তিনি তৈরী করেছিলেন বড় বড় প্রকোষ্ঠ এবং তার সামনে রেখেছিলেন একটা প্রশস্ত হলঘর। কার্ণাকে আমনদেবের যে মন্দির ছিল—এটি তারই অনুকরণে তৈরী হয়েছিল।

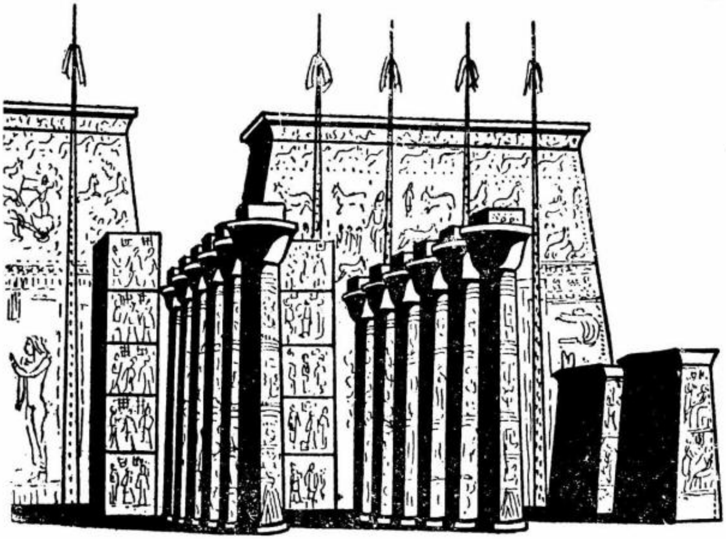

কার্ণাকের আমনদেবের মন্দির

হলঘরের সামনে তৈরী হলো এক চমৎকার বাগান। আবার বাগানের চারিদিকে নির্দ্দিষ্টদূর অন্তর বসানো হলো স্তম্ভের সারি। এই স্তম্ভশ্রেণী আজও দেখা যায় লাক্সোরে গেলে। আর তখন মনে পড়ে যায় ফ্যারাও তৃতীয় আমেনহোটেপের শিল্পানুরাগের কথা। ফ্যারাও লাক্সোরের এই স্তম্ভশ্রেণী ঘেরা বাগানের সামনে আবার তৈরী করালেন এক নতুন ধরণের বিরাট হলঘর। এ ধরণের হলঘর এর আগে মিশরে কেউ কখনও দেখেনি। হলঘরের দু'ধারে রাখা হলো বিরাটাকার থামের সারি। এত উঁচু থামের সারিও এর আগে নাকি এদেশে তৈরী হয়নি। থামগুলি বিরাটাকার হ'লে কি হবে, তাদের মধ্যে চমৎকার সামঞ্জস্য ছিল। এটাও শিল্পীদের কম কৃতিত্বের বিষয় নয়। থামগুলোর মাথায় প্যাপাইরাস ফুলের নক্সাযুক্ত কারুকার্য্য ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় অমন সুন্দর ও বিশাল হলঘরটা তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ করে যেতে পারলেন না ফ্যারাও। তার আগেই তিনি মারা গেলেন।

রাজা হলেন তাঁর ছেলে চতুর্থ আমেনহোটেপ। এই নতুন ফ্যারাও একটি মাত্র ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন। সে ঈশ্বরের নাম 'অ্যাটন'। একেশ্বরবাদী এই ফ্যারাও মিশরের সমস্ত দেবদেবীর

অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন এবং তাঁদের পূজাও বন্ধ ক'রে দিলেন। আমনদেবের ওপরই তাঁর রাগ ছিল সবচেয়ে বেশী। তাই তিনি পিতার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করলেন না। শিল্পের এক চরম নিদর্শন অসম্পূর্ণ অবস্থায় প'ড়ে রইল—ধীরে ধীরে মহাকালের কবলে লীন হয়ে যাবার জন্যে।

ফ্যারাও তৃতীয় আমেনহোটেপের আর একটা কীর্ত্তির কথা না বললে লাক্সোরের কাহিনী অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। আমনদেবের কার্ণাক এবং লাক্সোরের মন্দিরের দূরত্ব ছিল মাত্র দেড় মাইল। ফ্যারাও তৃতীয় আমেনহোটেপ ঐ জায়গায় তৈরী করলেন এক সুন্দর বাগান। বাগানের মধ্যে রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধভাবে গড়া হলো ভেড়ার মুখওয়ালা স্ফিংস। সাধারণ স্ফিংসের মাথার দিকটা হয় মানুষের মত আর নীচের অংশটা সিংহের দেহের মত। কিন্তু এই স্ফিংসের মাথা ভেড়ার মত। পাথরে খোদাই ক'রে তৈরী করা হলো এ স্ফিংসগুলো। প্রত্যেকটা স্ফিংসের সামনের থাবাদুটোর মাঝখানটায়—ঠিক ভেড়ার মুখের নীচে রাখা হলো ফ্যারাও তৃতীয় আমেনহোটেপের পাথরের মুর্ত্তি। ঐ স্ফিংসের সারির মাঝে মাঝে আবার তৈরী হলো বড় বড় স্তম্ভ আর গেট। স্তম্ভ এবং গেটগুলোর ওপর দিকটা সোনায় আর নীচের দিকটা রূপোয় মোড়া। চূড়াকৃতি পাথরের স্তম্ভগুলোর সারা গা জড়িয়ে দেওয়া হলো চক্‌চকে ধাতুর পাত দিয়ে। মোটের ওপর এসব মিলে এমন এক সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি হলো—জগতে যার তুলনা মেলা ভার।

মিশরের সাধারণ স্ফিংস

লাক্সোরের স্মৃতিসৌধ, মন্দির, স্তম্ভ, চত্বর প্রভৃতির কারুকার্য্য আজও জগতের বিস্ময়। সত্যিই, ভাবলে অবাক্ হতে হয়—চার হাজার বছর আগে মিশরীয় শিল্পীরা কি ক'রে অত বড় বড় সুন্দর কারুকার্য্য করা মন্দির আর অট্টালিকা তৈরী করেছিলেন। তখনকার দিনে তো বিজ্ঞানের উন্নতি মোটেই হয়নি। তখন ছিল না ক্রেন ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি; ছিল না প্রাসাদ তৈরীর উপকরণ সিমেণ্ট। তা সত্ত্বেও মিশরীয় শিল্পীরা গড়ে তুলেছিলেন অসংখ্য সুন্দর সুন্দর আকাশচুম্বী অট্টালিকা আর মন্দির। মিশরীয় শিল্পীদের এই শিল্পদক্ষতা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। তাই আজও সেই অতি প্রাচীন শিল্পীদের শিল্প-দক্ষতা বর্ত্তমান যুগের শিল্পীদের আদর্শ হয়ে রয়েছে। আমরা দিল্লীর লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের সৌন্দর্য্য দেখে অবাক হয়ে যাই; অবাক হয়ে যাই আমেরিকার 'ইউনাইটেড্ নেশ্‌নস্ বিল্ডিংস'-এর বিরাটত্ব দেখে। কিন্তু এসব তো সেদিনের তৈরী। বিজ্ঞান তো এখন অনেক উন্নত।

লাক্সোরের ধ্বংসস্তুপের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় সে যুগের ফ্যারাওদের অল্পবিস্তর ইতিহাস। কিন্তু কোথায় সেই অমর শিল্পীরা—যাঁদের প্রতিভা ও শ্রমে গড়ে উঠেছিল লাক্সোরের তথা সমগ্র মিশরের বিস্ময়কর ভাস্কর্য্য শিল্প? তাঁদের পরিচয় কোথাও মেলে না—শিল্পীদের নাম পর্য্যন্ত জানা যায় না। তবে কি সেই শিল্পীরা ছিলেন নাম-যশের আকাঙ্ক্ষাবিহীন সন্ন্যাসী? না, তা নয়। যে সব স্থপতি, শিল্পী ও ভাস্কর লাক্সোরের গৌরবসৌধ নির্মাণ করেছিলেন—তাঁরা ছিলেন বন্দী ক্রীতদাস। ফ্যারাও-এর শাসনে, দণ্ডের ভয়ে আর প্রবলপ্রতাপ পুরোহিতদের বিধিনিষেধ মেনে তাঁরা কাজ ক'রে গেছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে তাঁরা পাথর কেটেছেন। পরিবর্ত্তে পেয়েছেন সামান্য অন্নজল আর রাত্রে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম।

এই সব অখ্যাত হতভাগ্য শিল্পীদের কথা ভাবলে দুঃখ হয়। তবু সান্ত্বনা, যে—তাঁরা অজ্ঞাত হলেও অমর হয়ে আছেন। যতদিন লাক্সোরের ধ্বংসস্তুপের শেষ কণাটুকুও পড়ে থাকবে—ততদিন পর্য্যন্ত মানুষ ভুলবে না সেই অজ্ঞাত শিল্পীদের কথা। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁদের স্মরণ করবে।

● অবাক হয়ে শোন

১নং চিত্র। বরফের দেশ আইস্‌ল্যাণ্ড। সেখানে গাছপালার চিহ্ন কোথাও নেই। অথচ আজ থেকে এগারো শ' বছর আগে যখন আইস্‌ল্যাণ্ড প্রথম আবিষ্কার করা হয় তখন এই দেশ ছিল বনে জঙ্গলে ভরা। তখন যদি গাছপালা জন্মাতে পারে তবে আজই বা সেখানে গাছপালা জন্মাবে না কেন? তাই আজ অনেকেই চেষ্টা করছেন আইস্‌ল্যাণ্ডকে আবার সবুজ বনানীতে ভরে তুলতে।

২ নং চিত্র। সিঙ্গাপুরের নাগরিকরা শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করছে।

৩ নং চিত্র। সমুদ্রের সাংঘাতিক জীব হাঙ্গর। তার সামনে যে পড়বে তার আর রক্ষে নেই, হাঙ্গর অমনি তাকে গিলে ফেলবে। কিন্তু এই হাঙ্গরেরও বন্ধু আছে, সে হচ্ছে ছোট্ট একটা মাছ। সে হাঙ্গরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় খাদ্যের সন্ধানে। শত্রু এলে হাঙ্গরকে দেয় সাবধান ক'রে। হাঙ্গরও তার এই পরম উপকারীকে প্রতিদান দিতে ভুলে না। ছোট্ট মাছটিকে আপদ-বিপদে হাঙ্গর তাকে রক্ষা করে—আর নিজের খাবারের অংশ দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখে।

আব্দার

—শামসুদ্দীন

লেখা পড়া করব না আর
করব না ;
খাবার কিছু খাবনা মা,
খাব না।
জামা জুতা পরব না ক'
পরব না,
খেলাধূলাও করব না মা,
করব না।
অই দেখনা ছেলে মেয়ে আরো কত জন
আছে অমন দুস্থ কাঙাল মরছে সারাক্ষণ।
নেইক তাদের জামা-কাপড়, নেইক তাদের কিছু,
জুটছে নাক' খাবার খেতে, হচ্ছে মাথা নিচু।

ওরা যদি অমনি ক'রে মরবে ক্ষণে ক্ষণে,
ঘর ছাড়া সব ঘুরবে এমন নিত্য মরণ সনে।
স্বাধীন দেশের ছেলে হ'য়ে কেমন ক'রে আজ
ওদের ছেড়ে থাকব মাগো, পরব নয়া সাজ।
ওরাও মোদের ভাইয়ের মত
সমান অধিকার
দেশের মাটির, দেশের বায়ুর ;
ঘুচুক অবিচার।
তাই যদি না হয় ঃ
লেখাপড়া করব না আর
করব না,
খাবার কিছু খাব না মা,
খাব না।

হারানো মেয়ে

—কুমারী অঞ্জলি চন্দ্র

সেদিন কলেজের ছুটির পর সীমা বেরিয়ে আসে বন্ধুদের সঙ্গে। কলেজের সামনে গাড়ি পার্ক করবার জায়গায় সে লক্ষ্য করতে লাগলো, তাদের গাড়ি আছে কিনা? কিন্তু না। গাড়ি আজ আসেনি।

অগত্যা সে গিয়ে দাঁড়ায় গেটের সামনে—ট্রাম-স্টপেজের কাছে। দাঁড়িয়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

তার আশেপাশে তখন কলেজের বহু মেয়ে এসে ভীড় জমিয়েছে। সীমাকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা সকলেই প্রশ্ন করে, কেন সে ঐভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

ঠিক এমনি সময় সামনের পার্ক থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে একজন ভদ্রলোক সীমার সামনে এসে দাঁড়ান, এবং তাকে নমস্কার জানিয়ে বলেন,—"এই যে, রমলাদেবী যে! কি ব্যাপার বলুন তো আপনার? আজ একমাসের ওপর ছিলেন কোথায়? এদিকে আমাদের পার্টির মিটিং তো এসে পড়লো! অথচ আপনার কোন খেয়ালই নেই!"

সীমা সবিস্ময়ে বললো,—"কে আপনার রমলাদেবী? কিসের মিটিং? কি বলছেন আপনি? আমি রমলাদেবী নই—রমলাদেবীকে আমি চিনিও না!"

ভদ্রলোক আরও আশ্চর্য্য হয়ে বললেন,—"আপনি রমলাদেবী নন্? তবে আপনি···কি আশ্চর্য্য!"

ভদ্রলোকের কথা শেষ হয় না, এমনি সময় আর একজন স্ত্রীলোক এসে সীমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন,—"এই যে রমলা, বেশ মেয়ে যাহোক তুই! এতদিন ছিলি কোথায় শুনি?"

ভদ্রলোকটি তখন নবাগতা স্ত্রীলোকটিকে বললেন,—"বিভাদি, ইনি বলছেন, ইনি নাকি রমলাদেবী নন্!"

বিভাদি হেসে সীমাকে বললেন,—"সে কি রে! আজকাল তুই নাম পালটেছিস্ নাকি? বেশ, তোর নতুন নামটা কি বল্? এবার থেকে সেই নামেই তোকে ডাকবো!"

সীমা নিজেকে বড়ই বিব্রত বোধ করে। ভদ্রমহিলার মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বলে,—"দেখুন আপনারা ভুল করছেন! আমার নাম কোনদিনই রমলা ছিল না—আর আমি নামও বদল করিনি!"

বিভাদি বললেন,—"আঃ! সব সময় ঠাট্টা-ইয়ার্কি ভাল লাগে না! আয় এদিকে, তোর সঙ্গে একটা বিশেষ জরুরী কথা আছে!"

বলে তিনি সীমার হাত ধরে টান দিলেন।

নিরুপায় হয়ে সীমা তার বন্ধুদের দিকে চাইলো। তার বন্ধুরা এই ব্যাপারে বেশ মজা উপভোগ করছে। সকলেই তারা সকৌতূহলে ওদের দিকে চেয়ে আছে। প্রত্যেকের চোখেমুখেই একটা দুষ্টামির হাসি। রাগে সীমার গা জ্বালা করতে থাকে। ভাগ্যক্রমে ঠিক সেইসময় একটা ট্রাম এসে স্টপেজে দাঁড়ায়। অমনি এক হ্যাঁচ্‌কা টানে বিভাদির হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সীমা দ্রুত গিয়ে উঠে পড়ে ট্রামে…

আর একদিনের আর এক ঘটনা।

স্কুলের কাজ সেরে রমলা বেরিয়ে পড়ে স্কুল থেকে। বেরুবার সময় প্রধান শিক্ষিকা তাকে ডেকে বললেন, স্কুলের আগামী পুরস্কার-বিতরণের জন্যে কিছু জিনিষ কিনে আনতে।

এ-দোকান সে-দোকান ঘোরে; কিন্তু জিনিষ আর পছন্দ হয় না রমলার। শেষে নিউ মার্কেটের একটা দোকানে সে মনের মত জিনিষ খুঁজে পায়। দাম মিটিয়ে দিয়ে জিনিষগুলো ব্যাগে তুলতে যাবে, অমনি দোকানী বলে উঠলো,—"আপনি কেন বয়ে নিয়ে যাবেন? তার চেয়ে বরং আমি সন্ধ্যের পর জিনিষগুলো আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো।"

রমলা মৃদু হেসে বললো,—"আমার বাড়ি কোথায়, আপনি কেমন ক'রে জানলেন?"

দোকানী একগাল হেসে বললো,—"সেকি কথা! আপনাদের বাড়িতে তো শতবার বহু জিনিষ পৌঁছে দিয়ে এসেছি—আজ তো নতুন নয়! তাছাড়া কলকাতা সহরে ব্যারিষ্টার মিত্রের বাড়ি কে না চেনে? আপনি ভাবছেন, আপনাকে বোধ হয় আমি চিনি না! আপনার নাম তো সীমা দেবী!"

রমলা গম্ভীরমুখে বললো,—"আজ্ঞে আমি সীমা নই; আর কলকাতা সহরের লোক হয়েও ব্যারিষ্টার মিত্রের বাড়ি আমি চিনি না!…আচ্ছা, নমস্কার!"

রমলা বেরিয়ে আসে দোকান থেকে।

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে সীমা সোজা গিয়ে প্রবেশ করে তার মায়ের ঘরে। মাকে বলে,—"আজ গাড়ি পাঠাওনি কেন মা?"

মিসেস্ মিত্র বললেন,—"গাড়িটা দুপুরে খারাপ হয়ে যাওয়াতে সোফার সেটাকে গ্যারেজে নিয়ে গেছে। বলেছিল, তোর কলেজের ছুটি হবার আগেই সে গাড়িটাকে সারিয়ে কলেজে যাবে। বোধহয় সারানো হয়নি।"

সীমা বললো,—"গাড়ি যায়নি বলে আজ রাস্তায় যে কি বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেলো, তা আর কি বলবো মা! ছুটির পর আমি ট্রাম-স্টপেজে এসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় একজন লোক এসে আমাকে 'রমলাদেবী' বলে নমস্কার করলেন। তাঁর সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা ছিলেন, তিনিও ঠিক ঐ ভুলই করলেন! আমি যত বলি, আমার নাম রমলা নয়, তাঁরাও কিছুতে বিশ্বাস করবেন না! সে এক বিশ্রী ব্যাপার মা!"

শুনে মিসেস্ মিত্রের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। সেইদিনই তিনি ব্যারিষ্টার মিত্রকে ঘটনাটা বললেন। প্রৌঢ় ব্যারিষ্টারের মুখমণ্ডলও চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো সব শুনে। তিনি সীমাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, রমলার ঠিকানা সে জানে কিনা?

সীমা জানায়, রমলার ঠিকানা সে জানে না। তবে কলেজের ছুটির পর যদি আবার কোনদিন সেই ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার দেখা পায়, তাহলে হয়তো তাঁদের কাছ থেকে রমলার ঠিকানা জেনে নিতে পারবে।

ব্যারিষ্টার মিত্রকে ঘটনাটা বললেন

এরপর থেকে প্রতিদিন ছুটির পর সীমা খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক লক্ষ্য করে—যদি তাঁদের দেখা পায়। কিন্তু দেখা আর পায় না! ব্যারিষ্টার মিত্র রোজই কোর্ট থেকে ফেরার পর অধীর আগ্রহে সীমাকে ডেকে রমলার কথা জিজ্ঞেস করেন—কিন্তু তাঁকে হতাশ হতে হয়।

সেদিন কলেজে ঢুকতে গিয়ে সীমা হঠাৎ দেখা পেয়ে যায় সেই ভদ্রলোকের।

মা.চ তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে,—"শুনুন, আপনাদের সেই রমলাদেবীর ঠিকানাটা আমাকে বলতে পারেন ?"

ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে বললেন,—"দেখুন, কিছু মনে করবেন না! সেদিন আমাদের ভয়ানক ভুল হয়ে গিয়েছিল! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আপনাকে আর রমলা-দেবীকে দেখতে ঠিক একই রকম! দেখলে চেনাই যায় না আপনাদের! রমলা-দেবীর সঙ্গে দেখা আমার হয়েছে।"

সীমা আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে,—"ঠিক আমারই মত দেখতে ?"

—"হ্যাঁ, হুবহু এক !"

সীমা আর কলেজে ঢুকলো না সেদিন। ভদ্রলোকটির কাছ থেকে রমলার ঠিকানাটা জেনে নিয়ে বাড়ি এসে পৌঁছোলো। ব্যারিষ্টার মিত্র তখনও কোর্টে বেরোননি। সীমা তাঁকে রমলার ঠিকানা জানালো।

মিঃ মিত্র তখুনি সীমা আর মিসেস্ মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। সীমার নির্দ্দেশমত গাড়ি চালিয়ে দিল সোফার।

চলতে চলতে এক সময় মিসেস্ মিত্রকে প্রশ্ন করলো সীমা,—"মা, রমলা কে ? আর কেনই বা তোমরা এত আগ্রহ নিয়ে তার কাছে যাচ্ছো ?"

মিসেস্ মিত্র সংক্ষেপে শুধু বলেন,—"মা, তুমিও যেমন আমার মেয়ে, সেও আমার তেমনি মেয়ে !..."

কথাটা বলতে বলতে কান্নায় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়।

গাড়ি এসে থামে বৌবাজারের একটা অনাথ আশ্রমের সামনে। আশ্রমের সুপারিণ্টেনডেণ্টের কাছে রমলার খোঁজ পাওয়া গেল। কি একটা উপলক্ষে সেদিন রমলাদেবীর স্কুল বন্ধ ছিল। তাই রমলাকেও আশ্রমে পাওয়া গেল। সীমা আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করে, হুবহু তার মতনই দেখতে একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে। মিসেস্ মিত্র আর স্থির থাকতে পারেন না, 'মা ক্ষমা' বলে তাকে জড়িয়ে ধরেন নিজের বুকে !

মিঃ মিত্রের চোখও তখন শুকনো ছিল না। তিনি রুমালটা বের করে একবার চোখ দুটো মুছে নিলেন।

বৃদ্ধ সুপারিণ্টেনডেণ্ট এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন,—"ক্ষমা অর্থাৎ রমলা আপনাদের কে হয় ?"

মিঃ মিত্র বললেন,—"এরা ছিল দুই যমজ বোন—সীমা আর ক্ষমা। দুজনেই একই রকম দেখতে। কেবল ক্ষমার ডান বাহুতে লাল জড়ুলের দাগ আছে। এদের

যখন দু'বছর বয়স, তখন একদিন পুরীর মেলায় ভীড়ের মধ্যে ক্ষমা হঠাৎ হারিয়ে যায়। সে সময় তার পরণে ছিল লাল ফ্রক্ আর হাতে ছিল একটা সোনার তাবিজ। তাতে বাংলা অক্ষরে লেখা ছিল ওর নাম—'ক্ষমা'। তারপর এই দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গায় ওর খোঁজ করেছি—কিন্তু কোথাও খোঁজ পাইনি। শেষে সেদিন সীমার মুখে শুনি, একজন ভদ্রলোক সীমাকে রমলা বলে ভুল করেছেন। তারপর নিউ মার্কেটের এক চেনা দোকানদারের মুখেও শুনি, সে নাকি একটি মেয়েকে আমার মেয়ে সীমা বলে ভুল করেছে। এই সব শুনে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়, ঐ রমলা আমার হারানো মেয়ে ক্ষমা ছাড়া আর কেউ নয়!"

এতক্ষণ রমলা ওরফে ক্ষমা এবং সুপারিণ্টেনডেণ্ট—দুজনেই মন্ত্রমুগ্ধের মত মিঃ মিত্রের কাহিনী শুনছিল। এবার ক্ষমা মিসেস্ মিত্রের বুকে মুখ গুঁজে অশ্রুভরা কণ্ঠে ডাকলো,—"মা!"

অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছিল বলে আশ্রমের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মত নিজেকেও সে অনাথ বলেই জানতো। জ্ঞান হওয়ার পর আজ প্রথম সে 'মা' বলে ডাকলো।

ইত্যবসরে সুপারিণ্টেনডেণ্ট আলমারি খুলে একটি প্যাকেট বের ক'রে এনে ব্যারিষ্টার মিত্রের হাতে দিলেন। প্যাকেট খুলতে দেখা গেল, তাতে রয়েছে, সেই সুদূর অতীতের ছোট্ট ক্ষমার ছোট্ট লাল ফ্রক্ আর 'ক্ষমা' লেখা একটি ছোট্ট সোনার তাবিজ।

● **গল্প হলেও সত্যি** (শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়)

সিরাপিস্ নামে একটা যুদ্ধের জাহাজ বিলেত থেকে এসেছে খিদিরপুর ডকে। সাধারণকে দেখতে দেওয়া হবে তবে অফিসারের কাছ থেকে একটা পারমিট লিখিয়ে নিতে হবে। একটী এগারো বছরের ছেলে পারমিটের জন্যে সাহেব-অফিসারের ঘরের সামনে উপস্থিত হলো। সাহেবের আর্দ্দালি ভাগিয়ে দিল, অত ছোট ছেলেকে পারমিট দেওয়া হবে না। ছেলেটী ফিরে গেল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলো, সাহেবের ঘরে যাবার জন্যে পেছন দিকে একটা দরজা আছে। ছেলেটী নীচে নেমে পেছনের ঘোরা সিঁড়ি দিয়ে একেবারে সাহেবের সামনে গিয়ে হাজির হলো। সাহেব ধমক দিয়ে উঠলো, তুমি ওদিক দিয়ে কেন এলে? বালক অবিচলিত ভাবে বল্লো, সামনে দিয়ে তোমার আর্দ্দালি আসতে দিলো না কেন?

সাহেব পারমিট লিখে দিল। ছেলেটীকে ঘর থেকে বেরুতে দেখে আর্দ্দালি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি করে ঘরে ঢুকলে? ছেলেটী হেসে বল্লো, আমি ম্যাজিক জানি!

এই ম্যাজিক-জানা ছেলেটীই হলো স্বামী বিবেকানন্দ।

স্মৃতির দু'চার পাতা

—মুরারিমোহন বিট্

প্রবাসী শৈবাল সুদীর্ঘ দশ বছর পর গাঁয়ে ফিরছে। পাটনা থেকে ফিরছে বাংলার পল্লীগ্রাম —পানডাঙ্গায়। জলঙ্গী নদীর তীরে এই গ্রাম। শৈবালের মন ক্রমশঃ আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠছে। আর মাত্র কয়েকটা ষ্টেশনের ব্যবধান। ভাবছে, সে কি দেখতে পাবে দশ বছর আগের সেই পানডাঙ্গাকে ?

রাণীগ্রাম রেলষ্টেশন থেকে পানডাঙ্গা মাত্র এক মাইলের হাঁটাপথ। যানের মধ্যে একমাত্র সম্বল গরুর গাড়ি।

শৈবালের পিতা হরিনারায়ণবাবু ব্যবসা উপলক্ষে নিজের গ্রাম ছেড়ে পাটনায় গিয়ে আস্তানা পেতেছেন সে আজ প্রায় দশ বছর হ'ল। সেই থেকে আর গাঁয়ে ফেরেননি; গাঁয়ের জমিজমা, বাড়িঘর বিক্রি ক'রে তিনি গাঁ-ছাড়া হয়েছেন। শৈবালের তখন বছর তেরো বয়স।

শৈবালের মাসীর বাড়িও পানডাঙ্গায়। মাসিমা, মেসোমশাই, তাঁদের ছেলেমেয়ে; এ ছাড়া বড় ছেলেটির বিয়েও হয়েছে, তারপর ঝি, চাকর···সকলকে নিয়ে বেশ গোছালো সংসার। মেসো প্রফুল্লবাবু অবস্থাপন্ন লোক ··নামডাক আছে গাঁয়ে।

মাসীমা অনেকদিন থেকেই হরিনারায়ণবাবুকে চিঠি লিখছেন শৈবালকে একবার পানডাঙ্গায় পাঠিয়ে দেবার জন্য। বহুদিন গাঁ-ছাড়া হয়েছে, দু-চারদিন এসে ঘুরে যাক গাঁ থেকে। কিন্তু হরিনারায়ণ-বাবু গাফিলতি করেই এতদিন পাঠাননি শৈবালকে।

ট্রেণ চলেছে হু হু ক'রে। বেলা প্রায় দুটো; বাইরে প্রখর রোদ, দৃষ্টি যেন ঝলসে যায়। তবু শৈবাল মাথাটাকে কামরার জানলা দিয়ে বাইরে বের ক'রে পলকহীন চোখে চেয়ে আছে রৌদ্র-দগ্ধ সবুজ ক্ষেতগুলোর দিকে। চেয়ে চেয়ে ভাবছে অনেক কথা; ভাবছে দশবছর আগেকার শৈবালের কথা।

ষ্টেশনের প্রথম গুমটিঘরের পাশে একটা ছোট বিল আছে। সেই বিলে চুনো মাছ প্রচুর। পুঁটি, ল্যাটা, শিঙ্গি, মাগুর···এসব মাছ যথেষ্ট। শৈবাল এবং তার সাথীদের আরও দু-একজন মাঝে মাঝে ছিপ নিয়ে এই বিলে আসতো মাছ ধরতে। গুমটিওলা রজব আলির সঙ্গে তার আলাপ ছিল খুব। রজবের একটা ছেলে ছিল শৈবালের বয়সী। আতাহার তার নাম। খুব বন্ধুত্ব ছিল তার সঙ্গে। শৈবালরা ওকে 'আতা' বলে ডাকতো। তারা কি এখনও আছে ? হয়ত অন্য কোথাও চলে গেছে···তাদের বদলে হয়ত এসেছে অন্য গুমটিওলা। একদিন এই রজবের হাতের রান্না খেয়ে শৈবাল বাপের কাছে খুব মার খেয়েছিল। হরিনারায়ণবাবু নিজে গুমটিতে এসে রজবকেও বকুনি দিয়ে-ছিলেন। রজব তাঁর হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল। অথচ রজবের দোষ ছিল না বিন্দুমাত্র। রজব বার বার তাকে নিষেধ করেছিল—খোকাবাবু, আমাদের হাতের রান্না তোমাদের খেতে নেই। আমরা মুসলমান, তোমরা হিন্দু। তোমার মা-বাবা যদি জানতে পারেন—

কিন্তু সেদিন ডিমের এমন খোসবাই ছেড়েছিল যে, শৈবাল নাছোড়বান্দা! ঠিক রান্নার সময়-

টাতে গিয়েই সে হাজির হয়েছে। বললো,—"বারে, মা-বাবা জানবে কি ক'রে? তার চেয়ে বলো না, তোমার দেবার ইচ্ছা নেই।"

ওর অভিমান-ভরা সুর রজবের মনে কেমন যেন আঘাত হানে। সে আর 'না' বলতে পারে না। শৈবালের সঙ্গে ছিল আর একজন। দু'জনকে সে দু'টো ডিম খেতে দেয়। এবং বারবার তাদের সাবধান ক'রে দেয়, একথা যেন তারা কারুর কাছে প্রকাশ না করে।

শৈবালের বয়স তখন বছর দশেক। তার সঙ্গীটির বয়সও ঐরকমই হবে। ডিম খাবার পর কিন্তু শৈবালের মনে সত্যিই ভয় জেগেছিল, যদি একথা মা-বাবা জানতে পারে, তাহলে মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেবে!

তার সঙ্গীটিই গোল বাধালো। সে তার আরও পাঁচজন বন্ধুর কাছে শৈবাল ও নিজের রজবের রান্না ডিম খাওয়ার কথা প্রকাশ করলো। আর সেই কথা নানা কানে ঘুরতে ঘুরতে শেষে হরিনারায়ণবাবুর কানেও গিয়ে পৌঁছালো। সেকথা শুনে তিনি তো শৈবালকে রীতিমত খড়ম পেটা করলেন; কিন্তু পরে মনে মনে ভাবলেন, দশ বছরের ছেলের এ ব্যাপারে এমন কিছু দোষ থাকতে পারে না···রজবেরই সম্পূর্ণ দোষ। সে-ই জোর ক'রে তাদের দুজনকে ডিম খাইয়ে দিয়েছে।

এই অভিযোগ নিয়ে হরিনারায়ণবাবু যখন উগ্রমূর্ত্তি ধারণ ক'রে রজবের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন রজব অত্যন্ত বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হলেও হরিনারায়ণবাবুর বিরুদ্ধে তার বলবার সামর্থ্য ছিল না। সে বাধ্য হয়েই তাঁর হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিল।

শৈবালও ছিল সঙ্গে। তার অন্তর ছোট্ট হলেও এতটা অবিচার সে সইতে পারছিল না। বারবার সে বলবার চেষ্টা করছিল, রজবের কোন দোষ নেই—সে নিজেই চেয়ে নিয়েছিল রজবের কাছ থেকে। কিন্তু হরিনারায়ণবাবু সেকথা কানেই তোলেননি। অতটুকু ছেলের কথায় কান দিতে গেলে চলে না।

শৈবাল ভাবে, অথচ এই রজব একদিন বাঁচিয়েছিল তার প্রাণ। একথা জানে গাঁয়ের সকলেই —হরিনারায়ণবাবুও জানেন। কিন্তু কী ভীষণ স্বার্থপর মানুষের মন! সামান্য একটা তুচ্ছ কারণে পুত্রের জীবনদাতাকেও তিনি অযথা কটুকথা বলতে দ্বিধাবোধ করলেন না। শৈবাল লক্ষ্য করেছিল, অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত হয়ে রজবের দুচোখ বেয়ে টপ্‌টপ্ ক'রে গড়িয়ে পড়েছিল অশ্রু।

সুদীর্ঘ বারো-তেরো বছর পরেও সেদিনকার কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে শৈবালের। রবিবার ছিল সেদিন। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বন্ধু-বান্ধবে মিলে চারজনে গুমটির পাশের বিলে গিয়েছিল মাছ ধরতে। ওখানে গিয়ে আরও একজন সঙ্গী জুটলো—সে হল আতা। আর এই মৎস্য-শিকার অনুষ্ঠানের একমাত্র দর্শক হয়েছিল রজব। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কোন ট্রেণ ছিল না—তাই সে নিশ্চিন্ত মনে এসে বসেছিল ওদের কাছে—বসে বসে দেখছিল ওদের মাছধরা। বেশ খানিকটা দূরে দূরে পাঁচজনে পাঁচটা পৃথক্ জায়গা বেছে নিয়ে বসেছিল। রজব বসেছিল শৈবালের কাছে। ফাতনা একটু নড়তেই রজব চেঁচিয়ে ওঠে,—"টান মারো খোকাবাবু—টান মারো—মাছে খাচ্ছে!"

শৈবাল বিরক্ত হয়ে বলে,—"আঃ! চেঁচিও না! তুমি কিচ্ছু জানো না রজব চাচা! ফাতনা না ডুবলে ঝিঁক্ মারতে আছে?······ইস্! মাছটা পালিয়ে গেল! অত চেঁচালে মাছ খায় কখনো?"

বড়শীতে নতুন টোপ দিয়ে শৈবাল আবার একাগ্রমনে প্রতীক্ষা করতে থাকে। শবরীর প্রতীক্ষা যেন! একমাত্র ফাতনা ছাড়া সমগ্র জগৎটাই তার কাছে হারিয়ে গেছে তখন!

শৈবালের পাশেই ছিল একটা গর্ত্ত। শৈবাল এবং রজব—দুজনেই বসবার সময় দেখেছিল গর্ত্তটা। কিন্তু ওটা যে সাপের গর্ত, এবং একটা বিষধর সাপ যে ঐ গর্ত্তে বাস করছে, তা ওরা কল্পনাতেও আনতে পারেনি। শৈবালের ঠিক পাশেই গর্ত্তটা—মাত্র হাত দেড়েক তফাতে। আর রজব বসে আছে গর্ত্তটা থেকে প্রায় পাঁচ হাত দূরে।

আচমকা রজব সভয়ে লক্ষ্য করে, সাপটা ধীরে ধীরে গর্ত থেকে নিজের দেহটা বের ক'রে শৈবালের দিকে অগ্রসর হচ্ছে! দেখে রজবের সারা দেহ হিম হয়ে যায়। সাপটা ক্রমশঃই এগুচ্ছে শৈবালের দিকে। এক্ষুণি মহাসর্ব্বনাশ হয়ে যাবে!

তড়িতাহতের মত রজব উঠে দাঁড়ালো। পলকের মধ্যে দেখে নিল, হাতের কাছে কিছু আছে কিনা। দেখে ছোট একটা শুকনো গাছের ডাল প'ড়ে রয়েছে পায়ের গোড়ায়। নিতান্তই ছোট, হাত-খানেক লম্বা হবে হয়তো। অতটুকু একটা হাতিয়ার নিয়ে অমন হিংস্র জীবটির কাছে এগুনো—প্রাণ হাতে ক'রে অগ্রসর হওয়ারই সামিল। কিন্তু ভাববার সময় নেই। পাগলের মত ডালটা হাতে নিয়ে সে এক লাফে এগিয়ে যায় সাপটার মুখের কাছে। ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয় নাগরাজ। তারপরই রেগে গিয়ে ফণা বিস্তার ক'রে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রজবের হাতিয়ার ফণার ওপরে সবেগে আঘাত হানে! অব্যর্থ আঘাত! থেঁতলে যায় মাথাটা! সারা দেহটা অসীম যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ওঠে! তারপর খানিকক্ষণ দাপাদাপির পর নিথর হয়ে আসে নাগরাজ!

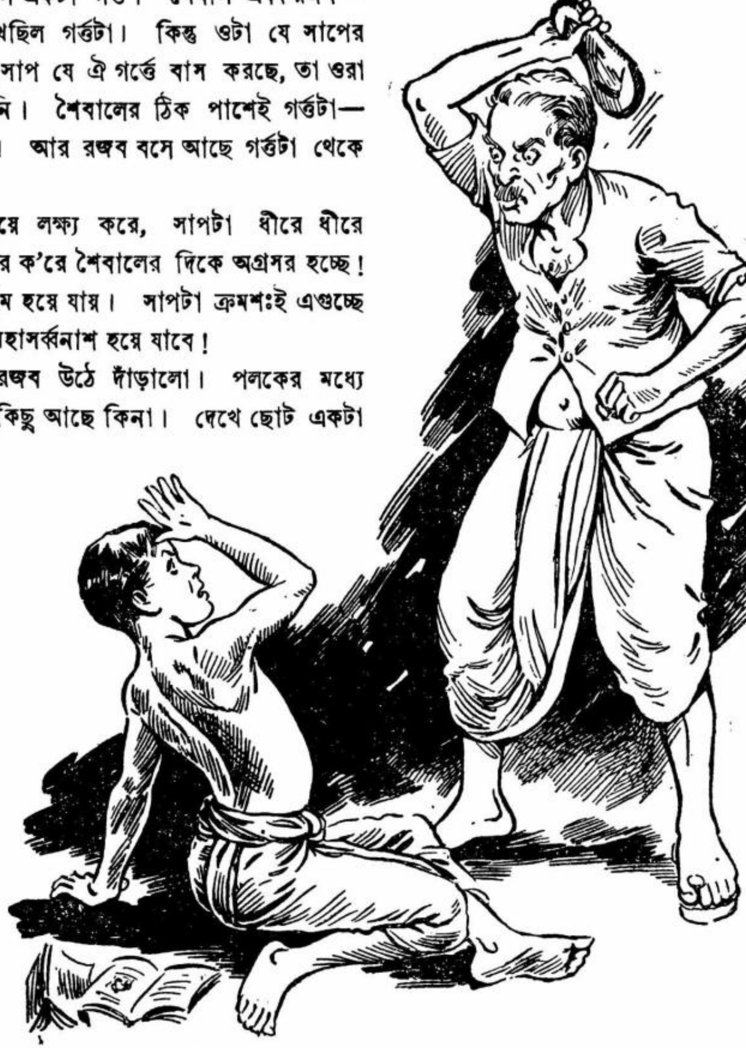

শৈবালকে রীতিমত খড়ম পেটা করলেন [পৃঃ ১৮৮

সে দৃশ্য দেখেছে শৈবাল, দেখেছে শৈবালের সঙ্গীরা···সেকথা শুনেছে সমগ্র গ্রামবাসী···শুনে ধন্য ধন্য করেছে। হরিনারায়ণবাবুও সেদিন প্রশংসা করেছিলেন রজবের। অথচ কত সামান্য কারণেই না সেই রজবকে তিনি অকথ্য গালাগাল দিলেন!

শৈবালের দু'চোখ চিক্‌চিক্ ক'রে ওঠে। ভাবে রজব এখন কেমন আছে, কোথায় আছে? আতাহার···আতা···সেই কালোরঙের ছেলেটা···সেই বা কেমন আছে?

শৈবালের আরও মনে পড়ে জলঙ্গীর ধারের বটগাছটার কথা। গাছটার গোড়া সিমেণ্ট দিয়ে গোল করে বাঁধানো। কে কত বছর আগে যে বাঁধিয়ে দিয়েছিল, তা শৈবালের জানা নেই। বহু বছর আগেকার বাঁধানো বেদী—চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। বড় বড় ফাটল ধরেছে। ফাটলে ফাটলে ঘাস গজিয়েছে প্রচুর। ঐ বেদীতে শৈবাল গিয়ে বসতো সময়ে-অসময়ে। বসে শান্তি পেত—উদাস দৃষ্টি মেলে জলঙ্গীর কালো জলের দিকে চেয়ে থাকতো চুপচাপ।

বাড়িতে যদি মা-বাপের কাছে কোন দিন বকুনি খেতো, অমনি ছুটে গিয়ে বসতো ঐ বেদীতে। অহেতুক বকুনি ভেবে বুক ভরে নিয়ে আসতো দুরন্ত অভিমান। বেদীতে বসে কেঁদে ফেলতো ঝর্‌ঝর্ ক'রে।

সে বকুনি শৈবালের কাছে 'অহেতুক' বলেই মনে হত। সে হয়ত মায়ের কাছে জানাতো ঘুড়ি-লাটায়ের আব্দার। মা দিতেন বকুনি। অমনি হ'ত ছেলের অভিমান! পাশের গাঁয়ে হয়তো চণ্ডীদেবীর মেলা দেখতে যাচ্ছে কয়েকজন সমবয়সী বন্ধু-বান্ধব; শৈবাল মায়ের পিছু পিছু ঘুরতে ঘুরতে ঘ্যানঘ্যানানি সুরু করলো। মা ছেলেকে বন্ধুদের সাথে অতদূরে যেতে দিতে নারাজ। শেষে বিরক্ত হয়ে দিলেন বকুনি—অমনি ছেলের হলো দুর্ব্বার অভিমান—ছেলে ছুটলো বটতলায়···বেদীতে বসে কাঁদতে লাগলো অঝোর ধারে।

সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করতেও ঐ বটতলা। আগামী হা-ডু-ডু ম্যাচে কে কে নামবে, গত ম্যাচে কে কে ভাল খেলেছিল, কে কে রাবিশ খেলেছিল; তারপর শিক্ষকদের সমালোচনা। কোন্ শিক্ষক কি রকম···কোন্ শিক্ষক ছাত্রদের ভালবাসেন···কে বাসেন না···ইত্যাদি।

হরিবাবুর কথা মনে পড়ে শৈবালের। ইস্কুলে নতুন এসেছিলেন হরিবাবু। মাষ্টারটা একেবারে বাজে! পড়া বুঝিয়ে দেবার বালাই নেই—কেবল বেত উঁচিয়েই আছে! সেইজন্যে ছাত্রেরা তাঁর নতুন নামকরণ করেছিল 'বেতবাবু'। এই বেতবাবুকে কেমন ক'রে জব্দ করা যায়, সে ব্যাপারে নানা ফন্দি-ফিকির আবিষ্কার করা হ'ত এখানে। কেউ বলতো, ওঁর চেয়ারের তলায় মটর দিলে কেমন হয়? কেউ বলতো, ওঁর বেতগুলো চুরি করলে উনি জব্দ হবেন! যত বেত উনি আনবেন, সব চুরি ক'রে ভেঙে ফেলবো আমরা! আবার কেউ বা বলতো, ওঁর বাড়িতে রাত্রে ঢিল ছুড়লে কেমন হয়? ভূতের ভয়ে গাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যাবেন নিশ্চয়!

শেষের যুক্তিটা অবলম্বন ক'রে যেভাবে হরিবাবুকে গাঁ-ছাড়া এবং স্কুল-ছাড়া করা হয়েছিল, তা হাস্যকর হলেও আজ আর হাসি পায় না শৈবালের। কেমন যেন করুণা হয়—কেমন যেন অনুতাপ হয়!

যুক্তি যেদিন স্থির হ'ল, সেইদিন রাত্রেই হরিবাবুর গৃহে ভৌতিক লীলা সুরু হয়ে যায়। দমাদম ইঁট পড়তে থাকে ঘরের চালে! একটা ডানপিটে ছেলে, সে শ্মশান থেকে সংগ্রহ ক'রে এনেছিল একটা মরা মানুষের মাথা। সেই মাথাটাও সবেগে নিক্ষেপ করা হ'ল হরিবাবুর বাড়ির উঠোনে।

রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা। হরিবাবু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। দমাদম শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন। লণ্ঠন হাতে ক'রে বাইরে এসে তো চক্ষু চড়কগাছ! ব্যাপার কি? কোথা থেকে এত ইঁট পড়ছে? উঠোনে ইঁটের ছড়াছড়ি···মড়ার মাথা···তিনি হাঁ ক'রে চেয়ে রইলেন। ধুপধাপ··· দমানে ইঁট পড়ছে! গল্পে শুনেছেন, ভূতে ইঁট ছোড়ে, মড়ার মাথা ছোড়ে···কিন্তু ভূত তিনি বিশ্বাস করেন না। তবে? আরো একটু পর বন্ধ হ'ল ইঁট পড়া। হরিবাবু চিন্তিতমনে ঘরে খিল এঁটে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন রাত্রে আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। কোথা থেকে যে ইঁট আসে বোঝা যায় না··· অথচ ইঁট পড়ে। ছোট, বড়, মাঝারি, লম্বা, বেঁটে···নানা রকমের ইঁট পড়তে থাকে।

ভয় পেয়ে যান হরিবাবু। চীৎকার ক'রে লোক জড়ো করেন। তাঁর চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ইঁট পড়াও বন্ধ হ'ল। লোকজন এসে দেখেশুনে নানারকম মন্তব্য করতে লাগলেন। বেশীর ভাগ লোকই ভৌতিক উপদ্রব বলে সন্দেহ করলেন। মাত্র দু'একজন—যাঁরা অন্তরে না হোক—অন্ততঃ মুখে ভূত বিশ্বাস করতে চান না, তাঁরা বললেন, দুষ্টু ছেলের কীর্ত্তি। দশচক্রে ভগবান ভূত হয়েছিল। হরিবাবুও দশচক্রে পড়ে ভূত বিশ্বাস করলেন, এবং পরদিন ভোরেই তল্পি-তল্পা গুটিয়ে পানডাঙ্গা ছেড়ে চলে গেলেন। আজ সত্যি শৈবালের বড় অনুতাপ হয় হরিবাবুর কথা ভেবে। বড় অন্যায় হয়েছিল তাঁকে এভাবে স্কুল-ছাড়া ক'রে।

এই বটতলার সঙ্গে আরও বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে শৈবালের। সে ভাবে, বটগাছটা কি এখনো আছে? দশ বছর আগেকার কথা। মাত্র তো দশটা বছর। কত যুগ ধরে যে গাছটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে, সে কথা আজকের পানডাঙ্গার কোন লোকই বলতে পারে না। আর মাত্র দশটা বছরের ব্যবধানেই সেই বিশাল মহীরুহ লোপ পেয়ে যাবে? এখনো বহুকাল বহু যুগ ধরে হয়ত অমনি অক্ষয়-অমর হয়ে ও দাঁড়িয়ে থাকবে!

ঐ বটতলারই কাছাকাছি ছিল নয়ন ঘোষের কুঁড়ে। নয়ন প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বটতলার বেদীতে বসে বসে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ভজন গাইতো। তার গানের সুর জলঙ্গীর জলে কাঁপতে কাঁপতে ওপারে চলে যেত। শৈবালের বড় ভালো লাগতো তার গান। এক-একদিন সন্ধ্যার পর সে পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়ে বটতলায় এসে তার গান শুনতো।

নয়ন বলতো,—"আজ তোমার পড়াশুনো নেই খোকাবাবু?"

শৈবাল নির্ব্বিবাদে মিথ্যা জবাব দিত,—"না।"

এরপর নয়ন বলতো,—"কিন্তু রাত-বিরেতে এসব দিকে এসো না খোকাবাবু! কত পোকা-মাকড়, সাপ-খোপ···"

অমনি সারা গা ছম্‌ছম্ ক'রে উঠতো শৈবালের। আগে সাপের নামে এত ভয় ছিল না। কিন্তু সেদিন গুমটির কাছে মাছ ধরতে গিয়ে যে কাণ্ড ঘটে গেছে, তাতে আজকাল সাপের নামে খুব ভয় করে। জিজ্ঞেস করলো,—"এদিকে সাপ আছে নাকি নয়নকাকা?"

—"বড় একটা দেখা যায় না; তবে মাঝে মাঝে বেরোয়। চল, বাড়ি পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে আসি তোমায়।"

পথে যেতে যেতে নয়ন গল্প বল্লে, কেমন ক'রে সে দু'-দুবার বিরাট দু'টো সাপ মেরেছিল।

তার বাড়ির আঙিনায় একটা, আর একটা ঐ বটতলার কাছেই বুড়ো ঝাউগাছটার গোড়ায়। একটা গোখ্‌রো, আর একটা চন্দ্রবোড়া। শৈবাল রোমাঞ্চিত হয়ে শোনে নয়নের কথা।

গল্প বলতে বলতে নয়ন শৈবালদের বাড়ির দরজার গোড়ায় এসে পৌঁছায়। বলে,—"যাও খোকাবাবু ; রাত-বিরেতে ওদিকে আর যেও না, কেমন ?"

শৈবাল ঘাড় নাড়ে।

—"আচ্ছা আমি চলি।"

নয়ন আর দাঁড়ায় না—গুন্ গুন্ ক'রে ভজন গাইতে গাইতে চলে যায়।

সে সব দৃশ্য যেন আজ ছবির মত মনে পড়ে শৈবালের।

ট্রেণ ছুটে চলেছে হু-হু ক'রে। আর মাত্র দু'টো ষ্টেশন। তারপরই সে তার জন্মভূমির মাটীতে পা দেবে। ষ্টেশনে নেমে আগেই সে যাবে রজবের কাছে। রজব যদি থাকে, সুদীর্ঘ দশ বছর পর খোকাবাবুকে দেখে সে নিশ্চয় খুব খুশী হবে। আতাও কম আনন্দ পাবে না। শৈবাল ভাবে, আতা কি তাকে চিনতে পারবে এতদিন পর ?

অন্যান্য বন্ধুদের কথাও একে একে মনে পড়ে শৈবালের। তার সবচেয়ে যে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল—সেই নন্তুকে সে আর দেখতে পাবে না। বছর পাঁচেক আগে শৈবাল তার মাসতুতো ভায়ের চিঠিতে জানতে পেরেছিল, টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে ছেলেটা।

শৈবালদের বাড়ির পাশেই থাকতো নন্তুরা। নন্তু আর নন্তুর বিধবা মা। বড়ই গরীব ছিল ওরা। নন্তুর বাবা দিনমজুরি খেটে কোনপ্রকারে সংসার চালাতেন। তিনি মারা যাওয়ার পর ওদের আর দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। নন্তুর মা পরের বাড়িতে ধান ভেঙে বহু কষ্টে সংসার চালাত। নন্তু ছিল তার চোখের মণি। নন্তুর মুখ চেয়ে সব দুঃখ-কষ্ট সে ভুলে থাকতো। কিন্তু ভগবানের তাও সহ্য হ'ল না। নন্তুকে তিনি কেড়ে নিলেন মায়ের বুক থেকে। সেই শোকে নাকি ওর মায়ের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তারপর পাগল অবস্থায় ঘর-বাড়ি ছেড়ে কোথায় যে চলে যায়, তার হদিস কেউ জানে না।

এই নন্তুর সঙ্গে শৈবালের একবার আড়ি হয়। ঝগড়ার সূত্রপাত হয়েছিল কেমন ক'রে, সেকথা আজ আর মনে পড়ে না। তবে আবার ফিরে ভাব হবার দৃশ্যটা আজও জলন্ত অক্ষরে লেখা আছে তার মনে।

আড়ি হওয়ার মাত্র কয়েকদিন পরেই দুজনের ভাব করবার সেকি আকুলি-বিকুলি! শয়নে-স্বপনে সবসময়েই ওদের চিন্তা, কেমন ক'রে ভাব হবে আবার ?—কেমন ক'রে ভাব করা যায় ? কিন্তু ভাব আর হয় না। নন্তু যেখানে খেলা করে, ঘুর-ঘুর করতে করতে শৈবাল গিয়ে হাজির হয় সেখানে। আবার শৈবাল যেখানে খেলা করে, নন্তু উপস্থিত হয় সেখানে। কিন্তু কোন কথাবার্ত্তাও হয় না—ভাবও হয় না।

এমনিভাবেই দিন কাটছিল।

প্রায় দেড়মাস পর এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে দু'জনের আবার মিলন হ'ল। সেদিনের সে-স্মৃতিও জড়িয়ে আছে ঐ বটতলার সঙ্গে।

সে এক বৈশাখের বিকাল। বটতলায় প্রতিদিনকার মত একদল ছেলে জড়ো হয়েছে।

'গুলিচি' খেলা হচ্ছে। খেলবার জায়গা হিসেবে প্রত্যেক ছেলেদেরই এই জায়গাটা পছন্দ। শৈবাল আর নন্তুও ছিল। নন্তু খেলছিল, আর শৈবাল ছিল দর্শকের দলে।

দর্শক এবং খেলোয়াড় প্রত্যেকেই তন্ময় হয়ে আছে। পশ্চিম আকাশে ক্রমশঃ ঘন কালো মেঘ জমছে, কারুর খেয়াল ছিল না সেদিকে! অকস্মাৎ প্রচণ্ড ঝড় উঠলো। ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেল চতুর্দ্দিক। খেয়াল হ'ল ছেলেদের। খেলা বন্ধ হ'ল।

ঝড়ের দাপাদাপিতে বড় বড় গাছগুলোর সে কি মাতামাতি! যেন এই মুহূর্ত্তে সব ভেঙে পড়বে হুড়মুড় ক'রে। ছেলেরা ছড়িয়ে ছিল চতুর্দ্দিকে। সবাই একত্রিত হয়ে বলতে লাগলো, "চল্ চল্ বাড়ি যাই। বাপ্‌রে কী ঝড়!"

কেউ কেউ বলতে লাগলো, "দেখছিস্ কী মেঘ করেছে—এক্ষুণি বৃষ্টি নামবে!"

ঠিক এমনি সময় ঘটলো একটা অঘটন। মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়লো একটা আমগাছের ডাল। ডালটা যেখানে পড়লো, ঠিক সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে ছিল নন্তু। ডালটা যখন ওপর থেকে ভেঙে পড়ে তখন শৈবালই প্রথম সেটা লক্ষ্য করে। ডালটাকে পড়তে দেখেই আচমকা সে চীৎকার ক'রে ওঠে,—"নন্তু! নন্তু! স'রে যা ওখান থেকে!"

নন্তু হতচকিত হয়ে পড়ে বুঝতে পারে না কিছুই।

শৈবাল আর একটা মুহূর্ত্তও দেরী করে না—বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গিয়ে সজোরে একটা ধাক্কা দিয়ে সে সরিয়ে দেয় নন্তুকে। নিজেও সরে যায়।

সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল নন্তু।

প্রত্যেকটি ছেলেই লক্ষ্য করলো ব্যাপারটা। তারা বলাবলি করতে লাগলো,—"ইস্! খুব বেঁচে গেছে নন্তু! শৈবাল যদি না দেখতো—"

কিন্তু শৈবাল বড় লজ্জায় পড়ে যায়। নন্তু হয়তো ভাববে, সে সেধে ভাব করবার জন্তেই 'নন্তু' বলে ডেকেছে, তার গায়ে হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়েছে। ছিঃ ছিঃ বড় লজ্জার কথা। শৈবালের মাথা হেঁট হয়ে যায়—মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে! তার মনে হচ্ছে, নন্তু এবং অন্যান্য সকলেই যেন তার দিকে তাকিয়ে ঐ কথা ভাবছে! শৈবাল যেন পাথর হয়ে গেল! একটু পরে মুখ তুলে চেয়ে দেখলো, সবাই দল বেঁধে বাড়ির দিকে ছুটতে সুরু করেছে। মাণিক ডাকলো, "আয় রে শৈবাল, পালিয়ে আয়; আবার ডাল ভেঙে পড়বে!"

শৈবাল কিন্তু লজ্জায় দলের সঙ্গে যেতে পারলো না। সবার অগোচরে দল ছাড়া হয়ে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো বাড়ির দিকে। কেউ লক্ষ্য করলো না শৈবালকে।

পরদিন সকালে নন্তু এসে উপস্থিত শৈবালদের বাড়ির কাছে। আড়ি হওয়ার পর থেকে এ পথে সে হাঁটেনি কোনদিন। ওদের বাড়ির দু-তিনখানা বাড়ির পরেই একটা শিবমন্দির। ঐ মন্দিরের সামনে ঘোরাঘুরি করতে থাকে নন্তু। লক্ষ্য, শৈবালদের বাড়ির দরজার দিকে। তার বুক দুরু দুরু করছে, কেমন ক'রে সে কথা বলবে শৈবালের সঙ্গে? তবু সে কথা বলবে···কথা বলতেই হবে তাকে?

একটু পরেই শৈবালের দেখা পেল সে। শৈবাল বেরুচ্ছে।

প্রথমবার ডাকতে গিয়ে মুখ দিয়ে স্বর বেরুলো না নন্তুর। তারপর গলায় খুব জোর এনে ডাকলো,—"শৈবাল—"

ডাকতে ডাকতে এগিয়ে এলো শৈবালের পাশে। শৈবাল নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো নন্তুর মুখের পানে।

নন্তু বললো,—"তুই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিস কাল। মা শুনে বললেন, 'আমাদের বাড়িতে আজ দুপুরে তোর নেমন্তন্ন।' যাবি তো? তোর মাকে বলে আসি কেমন?"

শৈবালকে রাস্তার মাঝখানে হতভম্বের মত দাঁড় করিয়ে রেখে নন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

শৈবাল ভাবে, সে নন্তু আজ আর নেই। কী ভীষণ প্রতীক্ষার পর কী মধুর মিলন যে হয়েছিল তাদের, সে কথা ভাবতে আজও চোখে জল এসে যায় শৈবালের।

রাণীগ্রাম ষ্টেশনে ট্রেণ থামলো। শৈবাল নেমে পড়লো ব্যাগ নিয়ে। গেটে টিকিট দিয়ে বেরিয়ে এলো প্ল্যাটফর্ম্মের বাইরে। ঐ যে দূরে গুমটিঘরটা দেখা যাচ্ছে। গুমটিঘর হয়ত ওখানে চিরকালই দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু রজব আলি, আতাহার···ওরা কি আছে?

মাসতুতো ভাই কুমারেশ শৈবালকে নিতে এসেছিল ষ্টেশনে। শৈবাল বললো,—"চল বড়দা গুমটির কাছ দিয়ে ঘুরে যাই।"

গুমটির কাছে এসে দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল শৈবাল। দেখলো, একটা বুড়ো বসে কি যেন করছে। কঙ্কালসার তার চেহারা। তবু রজবকে চিনতে পারলো শৈবাল। ইস্! সেই স্বাস্থ্যবান রজবের এমন চেহারা হয়েছে! ডাকলো,—"রজবচাচা!"

ফিরে তাকালে বুড়ো রজব। তারপর আস্তে আস্তে উঠে বাইরে এলো।

শৈবাল বললো,—"আমায় চিনতে পারছো না রজবচাচা? আমি যে তোমার খোকাবাবু—শৈবাল; মনে নেই, দশ-এগারো বছর আগে ঐ বিলে মাছ ধরবার সময় তুমি আমাকে সাপের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে?"

হ্যাঁ, রজবের মনে পড়ছে সেকথা।

—"মনে পড়েছে এবার?"—শৈবাল সাগ্রহে শুধায়।

রজবের মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে,—"হ্যাঁ, মনে পড়ছে! অনেকদিনের কথা! তা—দশ-এগারো বছর হবে বৈকি! কত ছোট তোমাকে দেখেছিলাম খোকাবাবু—আজ কত বড়টি হয়ে গেছ তুমি। আমার আতাহার যদি থাকতো, সেও আজ তোমার মত এত বড়টিই হত!" রজবের দু'চোখ বেয়ে হুহু ক'রে অশ্রু নেমে আসে।

—"আতা নেই!"

শৈবাল যেন পাথরের মত হয়ে যায়!

রজব হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে বলে,—"তোমাদের আতা আর বেঁচে নেই খোকাবাবু! যে কালসাপ তোমাকে খেতে গিয়েছিল, সে-ই আতাকে খেয়েছে! তোমাকে বাঁচালাম—কিন্তু আতাকে বাঁচাতে পারলাম না খোকাবাবু! তোমরা যেদিন চলে গেলে এ-গাঁ ছেড়ে, তার মাসখানেক পরেই আতাকে সে খেয়েছে!" ছোট ছেলের মত ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে রজব।

শৈবাল আর দাঁড়াতে পারে না। কুমারেশকে চলতে ইসারা জানিয়ে সে একপা একপা ক'রে সেখান থেকে চলে আসে।

সারা পথটা মনমরা হয়ে চললো শৈবাল। বাড়ির কাছাকাছি এসে শুধালো,—"আচ্ছা বড়দা, ঘাটের ধারে যে বাঁধানো বটগাছটা ছিল, গাছটা আছে এখনো ?"

—"না। ছিল এতদিন; গত বর্ষায় জলঙ্গী গাছটাকে ভেঙে নিয়েছে। বহুদিনের গাছ—গাঁয়ের সবাই কত দুঃখ প্রকাশ করলো!"

শৈবাল কোন কথা বলে না। সে ভেবেছিল, নন্তুর শোক, আতার শোক, আর রজবের কষ্টের কথা—সব কিছু ভুলবার চেষ্টা করবে বটগাছটার বাঁধানো বেদীতে বসে। কিন্তু ভগবান সে সুযোগটুকুও দিলেন না!

প্যালার কীর্ত্তি

—বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

প্যালারাম মল্লিক, ছিলো এক মোক্তার
মোক্তারী ছেড়ে দিয়ে গানে এলো ঝোঁক তার।
টাক মাথা দেখলেই ভাবে বুঝি ঢোলটা
'তেরে কেটে তেড়ে তাক্' ঠুকে দেয় বোলটা।
তাই দেখে ছেলে বুড়ো রেগে হলো অস্থির
প্যালারাম গান ছেড়ে শ্বাস ফেলে স্বস্তির।
গান ছেড়ে ভাবে প্যালা কুস্তিটা শেখা যাক
গামা আর গোবরের সাথে লড়ে দেখা যাক।
লড়বে কী প্যালারাম পিলে তার পেল্লাই
ছেলে বুড়ো জড়ো হয়ে যতো জোরে চিল্লাই।
চিৎপাত হলো প্যালা, হায় সে-কী শোক তার
প্যালারাম মল্লিক ফের হলো মোক্তার॥

শিল্পীর পুরস্কার

—শ্রীনকুল মুখার্জ্জী

অনন্তপুর রাজ্যের পশ্চিম সীমানা ঘেঁসে যে সরু নদীটা এঁকে বেঁকে চলে গেছে, তারই কিনারায় বসেছে এক বিরাট মেলা। প্রতি বছরেই মেলা বসে, এবারও বসেছে। এক মাস ধরে মেলা বসে। নানা দেশ-বিদেশ থেকে আসে নানা লোক নানা বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে। কেউ আসে জলপথে, কেউ স্থলপথে। নির্জ্জন নদীকিনারা কোলাহল মুখরিত হয়ে ওঠে বছরে একবার।

দোকানপাট বসেছে সারি সারি। কত রকমের জিনিষ। খাবারের দোকান, খেলনার দোকান, নানা রকম তামাসা। অগণিত লোক আসছে যাচ্ছে দেখছে কিন্‌ছে। দিনের শেষে যখন সূর্য্য অস্ত যায়, মেলার কোলাহল ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে আসে। যে যার ঘরে ফেরে। রাতের অন্ধকারে নদীকিনারা ঘেঁসে জ্বলে মিট্‌মিট্‌ ক'রে আলোর মালা। চারিদিক স্তব্ধ, শান্ত। রাত কাটিয়ে সূর্য্যোদয়ের সাথে সাথে মেলায় আবার জীবন ফিরে আসে। এমনি ক'রে কোথা দিয়ে কেটে যায় একটা মাস, অনন্তপুরের বাসিন্দারা তা টের পায় না।

বালক, বৃদ্ধ, মেয়ে-পুরুষ সকলেই সমান উৎসাহ নিয়ে মেলায় আসে প্রতিবারই। এবারেও এসেছে, দেখেছে, মনের মত জিনিষ কিনেছে, কিন্তু এবারের একটি জিনিষ ওরা আর আগে কখনও দেখেনি। কোন্ এক দেশ থেকে এসেছে এক শিল্পী। মেলার শেষ প্রান্তে একটা ছোট্ট ঘরে সে বসেছে দু'টো মাত্র মূর্ত্তি নিয়ে। সাদা পাথরে খোদাই করা সে মূর্ত্তি, অদ্ভুত সুন্দর! অফুরন্ত ভাস্কর্য্যের পরিচয় জেগে রয়েছে মূর্ত্তি দু'টোকে ঘিরে। দর্শকেরা আসে, দেখে প্রশংসা ক'রে, চলে যায়, কিন্তু কেনবার প্রয়োজন বিশেষ কেউ বোধ করে না। তাদের বাস্তব জীবনে ঐ দু'টো পাথরের মূর্ত্তির কিই বা প্রয়োজন আছে!

কয়েকজন ধনী, সৌখীন খদ্দের মূল্য জিজ্ঞাসা করেছিল মূর্ত্তি দুটোর।

বিদেশী শিল্পী উত্তর দিয়েছিল—'অমূল্য'। খদ্দেররা উত্তর শুনে অবাক্ হয়ে যায়। মেলায় এই ধরণের সামগ্রী এই প্রথম। কিন্তু যার মূল্য অমূল্য তাকে কেই বা কিনতে পারে। ধনী ক্রেতারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। কেউ কেউ বা পাগল আখ্যা দিয়ে চলে যায়।

কথাটা ধীরে ধীরে অনন্তপুরের রাজার কানে গেল। ডেকে পাঠালেন তিনি বিদেশী শিল্পীকে। কি এমন সে সৃষ্টি করেছে যার মূল্য এ রাজ্যের ধনী ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত

দিতে পারে না! লোকের মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে সারা রাজ্যে। সকলেই উৎসাহিত হয়ে ওঠে—দেখা যাক রাজা এবার কি করেন।

পরদিন—রাজসভায় লোক ধরে না। রাজপারিষদ অমাত্যগণ সকলেই উপস্থিত। বহু সাধারণ লোকও উপস্থিত। কোথাও তিল ধরবার স্থান নেই।

ধীরে ধীরে প্রবেশ করল সেই শিল্পী। পিছনে দু'টো লোকের মাথায় সেই দু'টি মূর্ত্তি। সিংহাসনের নিকটে এসে শিল্পী রাজাকে অভিবাদন ক'রে দাঁড়ালো। রাজার আদেশে মূর্ত্তি দু'টোকে একটা পাথরের তৈরী উঁচু জায়গায় রাখা হ'ল। রাজসভা স্তব্ধ।

রাজা অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন মূর্ত্তি দু'টোকে। প্রশ্ন করলেন তিনি শিল্পীকে,—"এ দু'টোর সৃষ্টি তুমি করেছ?" শিল্পী আর একবার অভিবাদন ক'রে উত্তর দিল,—"বহু পরিশ্রম আর অধ্যবসায় দিয়ে এ দু'টো বানিয়েছি মহারাজ।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন,—"মূল্য।"

শিল্পীর সেই একই উত্তর—"অমূল্য মহারাজ।"

মৃদু গুঞ্জরণ উঠল রাজসভা ঘিরে। কয়েকজন অমাত্য বলে উঠল,—"শিল্পীর এই ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন না মহারাজ। এ শুধু মহারাজকে অপমান করবার একটা ছল মাত্র।"

রাজার ইঙ্গিতে শান্ত হ'ল রাজসভা। রাজা প্রশ্ন করলেন শিল্পীকে,—"এই দু'টো সৃষ্টির মধ্যে কোনও অর্থ আছে কি?"

শিল্পী উত্তর দিল,—"হাঁ, একটি সত্য আর একটি সুন্দরের প্রতীক মহারাজ। আমার শিল্পী-জীবনের এদু'টো শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমি ঐ পাথরের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছি।"

রাজা আবার মূর্ত্তি দু'টোকে দেখলেন ভালভাবে। চমৎকার, সুন্দর,—রাজা মৃদু হাসলেন। "কিন্তু শিল্পী",—রাজা আবার প্রশ্ন করলেন,—"তুমি কি মনে কর আমার এই রাজভাণ্ডার এতই স্বল্প যে তোমার এই মূর্ত্তি দু'টো কেনবার আমার সামর্থ্য নেই?"

শিল্পী অভিবাদন ক'রে বলল,—"সে বিচার করবার সামর্থ্য আমার নেই মহারাজ। এ আমার জীবনের সার্থক কীর্ত্তি। এর মূল্য কি হতে পারে আমি নিজেই জানি না। অপরাধ ক্ষমা করবেন মহারাজ।"

রাজসভা আবার গুণ গুণ ক'রে উঠল। রাজা উঠলেন সিংহাসন ছেড়ে, বললেন,—"আচ্ছা, শিল্পী—কাল এসো, তোমার সৃষ্টির আমি যথাযথ মূল্য দেবো।"

রাজসভা ভেঙ্গে গেল। নানাজনে নানারকম মতামত ব্যক্ত করতে করতে চলে গেল। সকলেই উৎকণ্ঠিত—কি হবে কাল।

পরদিন।

রাজসভা ভরে উঠল। কোথাও ঠাঁই নেই। চারিদিকে লোক গিসগিস করছে। ধীরে ধীরে শিল্পী এসে দাঁড়ালো সিংহাসনের পাশে, মাথা নত ক'রে।

রাজা চাইলেন শিল্পীর দিকে,—"তাহ'লে বিদেশী শিল্পী, এ মূর্ত্তি দু'টো তুমি অমূল্য ক'রেই রাখতে চাও, কি বল? তাহ'লে এদু'টোকে আমিই গ্রহণ করলাম।"

মহারাজ, আমি আমার পুরস্কার পেয়েছি। [পৃঃ ১৯৯

শিল্পী রাজাকে অভিবাদন করল,—"যথা আজ্ঞা মহারাজ।"

রাজা বললেন,—"কিন্তু তোমাকে একটু কাজ ক'রে দিতে হবে। তুমি তো শিল্পী তুমিই ভালভাবে পারবে। এই যে রাজ-দরবারের প্রধান তোরণটা দেখছ, ওর ঠিক মাঝখানে ঐ যে খালি জায়গাটুকু আছে, সেইখানে এই মূর্ত্তি দুটোকে এমনভাবে বসিয়ে দাও যাতে রাজদরবারে প্রবেশ করবার সময় সকলেরই ঐ দু'টো নজরে পড়ে। সকলেই যেন দেখতে পায় শিল্পীর এই অমর কীর্ত্তি, সত্য এবং সুন্দরের প্রতীক দু'টিকে। আর তার নিচে তোরণের গায়ে খোদাই ক'রে লিখে দাও তোমার নাম, শিল্পীর নাম।"

রাজাদেশে লোকজন এলো শিল্পীকে সাহায্য করতে। যথাযথ ভাবে শিল্পী রাজাজ্ঞা পালন করল।

এবার শিল্পীর বিদায় নেবার পালা। সিংহাসনের কাছে এসে সে রাজাকে অভিবাদন ক'রে দাঁড়ালো।

রাজা হেসে বললেন,—"হে শিল্পী, তোমার সৃষ্টি অতীব সুন্দর। কোন পার্থিব মূল্যই ওর সমান হতে পারে না। অতএব ও-দু'টোকে আমি অমূল্য করেই রাখলাম।

আমার রাজদরবার এখন থেকে ঐ সত্য এবং সুন্দরের প্রতীক নিয়ে শোভা বর্দ্ধন করবে, আর সেই সঙ্গে প্রচারিত হবে তোমার নাম, শিল্পীর নাম। যে নামে শিল্পী বেঁচে থাকবে তার মৃত্যুর পরেও, যে নাম ঘোষিত করবে শিল্পীর অমরকীর্ত্তির কাহিনী। তোমার শিল্পের এই কি যথেষ্ট পুরস্কার নয়? বল।"—রাজা চাইলেন শিল্পীর দিকে।

বিদেশী শিল্পীর চোখে জেগে উঠল এক আনন্দের জ্যোতি। মুখে এক পরিতৃপ্তির হাসি।

"মহারাজ, আমি আমার পুরস্কার পেয়েছি। এর থেকে বেশি আমার আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই।"

সভাশুদ্ধ লোক সমস্বরে জয়ধ্বনি ক'রে উঠল,—"জয় মহারাজের জয়।"

ধীরে ধীরে রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেল শিল্পী। তার শিল্পের সওদা হয়ে গেছে।

রাজসভা ভেঙে গেল। যাবার পথে সবাই চাইল একবার ক'রে তোরণদ্বারের দিকে, যেখানে প্রস্তরমূর্ত্তি দু'টোর নিচে খোদাই করা রয়েছে বিদেশী শিল্পীর নাম—যা চিরদিন অমর হয়ে থাকবে।

● জেনে রাখা ভালো

১ নং চিত্র। পৃথিবীর মধ্যে উষ্ণমণ্ডলে আকাশকে সব থেকে নীল দেখায়। আকাশের এই নীলাভ, উচ্চে মাত্র কয়েক মাইল বিস্তৃত। তেরো মাইল উপরে উঠলে আকাশকে আর নীল দেখায় না। ঘোর অন্ধকার সেখানে চারিদিক ঘিরে থাকে।

২নং চিত্র। সূর্য্যের উদয়ে "সূর্য্যোদয় হয় না। পৃথিবীর ঘূর্ণনে সূর্য্যোদয় হয়। পৃথিবীর ঘোরার ফলে, সূর্য্য যেন দিকচক্রবালে উঠে বলে মনে হয়।

৩নং চিত্র। যতদিন পৃথিবীতে হিংসা ও হিংসামূলক প্রতিযোগিতা থাকবে ততদিন কেউ থাকবে প্রভু আর কাউকে সইতে হবে কারাগারের কষ্ট।

বিপদের মুখোমুখি

[শিকার কাহিনী]

—শ্রীপ্রবীরকুমার

রাম সেনের শিকারী বলে বন্ধু-মহলে বরাবরই খ্যাতি ছিল। কিন্তু কেবল শিকারী বললে তাঁকে ছোট করাই হয়। যে কেউ একবার মাত্র শিকারের সময় তাঁর সঙ্গী হয়েছে, সে-ই জানে, কী অদ্ভুত তাঁর সাহস! সে-সময় তাঁর সঙ্গীদের যদি কেউ বিপদে পড়তো, নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রেও তিনি তাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতেন।

একদিনের ঘটনা বলি।

তখন ছিল শীতকাল। বন্ধু-মহলে রটে গেল, রাম সেন আবার শিকারে বেরুবেন। সামনে বড়দিনের কয়েকদিন ছুটি। কলেজ বন্ধ। হাতেও বিশেষ কোন কাজ নেই। ইউ. টি. সি.তে বন্দুক ছোঁড়ার ট্রেনিং নিয়েছি। ভাবলাম, বীরত্ব দেখাবার এমন সুযোগ ছাড়ি কেন? ঘুরে আসি না কেন একবার আমাদের রামদার সঙ্গে। চাই কি, ভাল সাহস দেখিয়ে একটা কিছু শিকার করতে পারলে, বন্ধু-মহলে রামদার সঙ্গে আমার নামটাও শিকারী বলে ধরা হবে।

তখুনি রামদার সঙ্গে দেখা ক'রে সব ব্যবস্থা পাকা ক'রে ফেললাম। শিকারের চিন্তার মধ্যে উত্তেজনা থাকলেও কোলকাতা থেকে যখন আমরা সুন্দরবনের দিকে যাত্রা করলাম, তখন যেন বড় ভয় ভয় করতে সুরু করলো। আগেই বলে রাখা ভাল, এর আগে আলিপুরের খাঁচা ছাড়া বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি আমার আর কখনো হয়নি। বার বার মনে হতে লাগলো, আবার ফিরে আসবো তো? এই সুন্দর কোলকাতা মহানগরী—একে আবার দেখতে পাবো তো?

সেবারে আমরা ছিলাম তিনজন। আমি, রামদা, আর রামদারই আর এক অফিসের বন্ধু। বন্ধুটি আরও দু'বার রামদার সঙ্গে শিকারে গিয়েছিলেন। আমাকে সাহস দেবার জন্য তাঁরা নানা

রকম গল্পের অবতারণা করতে থাকেন ; কিন্তু মুখে সাহস দেখালেও মন আমার ক্রমশঃই ভয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ছিল।

গ্রাম থেকে সকাল বেলা কিছু খেয়ে নিয়ে শিকারীর পোষাক পরে সঙ্গে কিছু পাঁউরুটি আর ফ্লাস্কে চা নিয়ে আমরা যাত্রা করলাম বাঘের উদ্দেশ্যে।

স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া গেল, আজ ক'দিন ধরে নাকি একটা বাঘ গ্রামে ভীষণ অত্যাচার করছে। আজ এর গরু, কাল তার ছাগল তো নিয়ে যাচ্ছেই, এর ওপর মোড়লের ছেলেকে নাকি পরশু রাত্রে ধরে নিয়ে গেছে। খবরটা শুনে আমার মনে হ'ল, এ যাত্রা বন থেকে কেবল এক রামদা ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কেউই বোধ হয় ফিরবে না।

মনের ভাব যথাসম্ভব মনেই চেপে রেখে শিকারী-বুট ঠক্ ঠক্ ক'রে হাতে বন্দুক ঝুলিয়ে আমরা যাত্রা করলাম সেই বাঘটার উদ্দেশে।

বনের মধ্যে ঢুকেই রামদা আমাদের নির্দ্দেশ দিলেন নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করতে। কেন যে রামদা আমাদের নিঃশব্দে অনুসরণ করতে বললেন, তা প্রথমটা বুঝিনি। বুঝলাম খানিকক্ষণ পরে, যখন মাটির ওপর বাঘের বিরাট বিরাট পায়ের ছাপ আর তাজা রক্তের দাগ সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। রামদার বন্ধু ভয় পেয়ে গিয়ে রামদাকে প্রশ্ন করেন,—"রক্তটা কিসের ?"

উত্তরে রামদা বলেন,—"শিকার মুখে ক'রে বাঘটা যখন বনের মধ্যে ঢুকেছে, তখনই এই রক্ত মাটির ওপর পড়েছে। রক্তটা জন্তুরও হতে পারে, মানুষেরও হতে পারে।"

—মানুষেরও হতে পারে !

কথাটা শুনেই ভয়ে মনটা কেমন ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো। কারুরই মুখে কোন কথা নেই ! পায়ের চাপে কেবল শুকনো পাতা ভাঙার মচ্‌মচ্ শব্দ।

আমরা যে পথটা দিয়ে চলেছিলাম, সে পথটা একটা সোজা মাটির টিলার কাছে এসে শেষ হয়ে গেছে। টিলাটাও বেশ উঁচু। ওদিকে যে কি আছে, তা টিলার ওপর না চড়ে দেখবার উপায় নেই। রামদা আমাকে লক্ষ্য ক'রে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললেন,—"কাছেই বাঘ থাকা সম্ভব।"

ঠিক সেই সময় একটা-ঘর্-র্-র্ ঘর্-র্-র্ আওয়াজ আমাদের কানে এলো। টিলার পাশে একটা ঝোপ ভীষণভাবে দুলে উঠলো। পরমুহূর্ত্তেই একটা বিরাট বাঘ বিড়ালের মত লাফিয়ে লাফিয়ে টিলার উপর উঠতে লাগলো। গায়ের হলদে রঙের ওপর কালো ডোরা কাটা দাগ ! সূর্য্যের আলোতে তার মসৃণ দেহ যেন চক্ চক্ ক'রে উঠলো। একটা উৎকট বিশ্রী গন্ধে সেখানকার সমস্ত বাতাস ভরে উঠলো। আলিপুর চিড়িয়াখানায় সুরক্ষিত খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে বাঘ দেখার একরকম অনুভূতি, আর অনভিজ্ঞ হাতে বন্দুক নিয়ে সুন্দরবনে বাঘের মুখোমুখি দাঁড়ানো আর এক অনুভূতি।

রামদার বন্ধু ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বন্দুক তুলে ধরে গুলি ছুঁড়লেন। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আওয়াজ হ'ল—গুড়ুম—গুড়ুম !

ততক্ষণে বাঘটা ঠিক টিলার ওপরে উঠে গেছে ; বন্দুকের আওয়াজ শুনে পিছন ফিরে একবার আমাদের দেখে নিল। সে কী বীভৎস তার চোখের চাহনি ! যেন দুটো নীল আগুনের

গোলা দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলো! পরমুহূর্ত্তেই বন কাঁপিয়ে ব্যাঘ্ররাজ দিলেন একটি হুঙ্কার। তারপর টিলা থেকে লাফিয়ে পড়ে অদৃশ্য হলেন।

রামদাও তাড়াতাড়ি টিলার ওপরে উঠতে থাকেন। কলের পুতুলের মত আমরাও তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলুম। টিলার ওপরে উঠে দেখি ততক্ষণে বাঘ মহাপ্রভু পৌঁছে গেছেন পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে ছোট্ট একটা সরু নদীর ধারে। তাকে নদী বললে নদীর অপমানই করা হবে। একটা ছোট খাল বলা চলে। সমুদ্রের জল সেই খালের মধ্যে ঢুকে বনের মধ্যে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। সেখানে বাঘটা হঠাৎ মাটির ওপর চারটে পা দুমড়ে শুয়ে পড়লো। তারপরই লাফিয়ে অনায়াসে খালটা পার হয়ে গেল। ততক্ষণে আমরাও রামদার পেছন পেছন খালের ধারে এসে পৌঁচেছি। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, বাঘটা গেল কোথায়? ওপারে তো তার চিহ্নমাত্রও নেই!

খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে রামদাকে প্রশ্ন করি,—"বাঘটা তাহলে ভয় পেয়ে পালিয়েছে কি বলেন?"

—"পালিয়েছে! না ওপারে গা-ঢাকা দিয়ে আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করছে! যত তাড়াতাড়ি পারো, এইবেলা গাছে উঠে পড়ো। নইলে কোন্ সময় যে বাঘটা ওপার থেকে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে, কে জানে!"

রামদার কথা শুনে চক্ষু তো স্থির হয়ে যাবার জোগাড়! ভয়ে আমার ভীষণ পিপাসা পেয়ে গেল—মুখের ভেতরটা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। সামনে জল দেখে মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে নিজেকে খানিকটা সুস্থ ক'রে নেব ভাবলাম। কিন্তু যেই জলে হাত দিতে যাব, সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে রামদা আমার শার্টের কলারটা টেনে ধরলেন। চেঁচিয়ে বললেন,—"করছো কি? মনে রেখো, এটা সুন্দরবন! এখানে ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর! কুমীর এখুনি লেজের এক ঝাপটায় তোমাকে কোথায় যে ফেলে দেবে, ঠিকানা নেই!"

প্রথমটা রামদার কথা বিশ্বাস হ'ল না। তাই রামদার মুখের দিকে বোকার মত চেয়ে রইলাম। আমার মনের কথা বুঝতে পেরে দূরে রৌদ্রে পড়ে-থাকা একটা গাছের গুঁড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে রামদা বললেন,—"ভাবছো ওটা গাছের গুঁড়ি? তা মোটেই নয়! শিকার ধরবার আশায় কুমীর ঐভাবে মড়ার মত পড়ে আছে!"

রামদার কথা শুনে ভয়ে আমার হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে যাবার যোগাড়। তখন খানিকটা প্রাণের দায়েই তাড়াতাড়ি আমরা তিনজনে একটা গাছে উঠে পড়লাম। তিনজনে তিনটে গাছের ডাল আশ্রয় ক'রে ভগবানের নাম-জপ করতে লাগলাম।

ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে আমার হাতে দিয়ে রামদা আমাকে বলেন,—"খেয়ে নাও, শরীরে বল পাবে।"

চা খেয়ে শরীরে যেন নতুন উদ্যম ফিরে এলো। ওদিকে সূর্য্যদেবও ক্রমশঃ মাথার ওপর থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়েছেন। ঘড়ির কাঁটা ঘোষণা করে, আর দুঘণ্টা পরে সূর্য্য অস্ত যাবে!

বন-পথ ধরে অন্ধকারে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেও আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু সে কথা রামদাকে বলবার উপায় নেই। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওপারের দিকে চেয়ে বাঘের প্রতীক্ষা করছেন।

ওপারের একটা ঝোপ হঠাৎ দুলে উঠলো। পরমুহূর্ত্তে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সেই ব্যাঘ্ররাজ! চোখে তার কী হিংস্র চাহনি! সে এক-একবার পিছন দিকে চায়, আবার মুখ ফিরিয়ে আমাদের লক্ষ্য করে। আমার তখন কেবলই মনে হচ্ছে, বাঘটা যদি সোজা লাফিয়ে এসে পড়ে আমাদেরই গাছের নীচে?

হঠাৎ সর্ সর্ ক'রে কিসের যেন আওয়াজ শোনা যায়। বাঘের ওপর থেকে চোখ ফেরাতে তখন আর ইচ্ছা হচ্ছিল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ ফেরাতে হ'ল, যখন ঝপাৎ ক'রে একটা শব্দ হ'ল! মুখ ফিরিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল! একটা ময়াল সাপ গাছের ডালে নিজের দেহটাকে জড়িয়ে নিয়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছিল। আমরা গাছে ওঠাতে তার সুখ-নিদ্রা ভেঙে যায়। গাছের ডালের পাক খুলতে-খুলতে সাপটা দোল খাচ্ছে। আর প্রতিমুহূর্ত্তে রামদার বন্ধুকে ধরে জলযোগের চেষ্টা করছিল। খুব সম্ভব রামদার বন্ধু বিপদের গুরুত্ব অনুভব ক'রে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়েছেন! মাটির দিকে চেয়ে দেখি, তিনি কেবল মাটিতেই পড়েননি, একেবারে গিয়ে পড়েছেন খালের ধারে।

সাপের হাত থেকে রেহাই পেলেও, কুমীর বা বাঘের পেটে তাঁকে যে যেতে হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই!

ভয়ে আমি তখন ভগবানের নাম জপ করতে লাগলাম।

ওদিকে জলের ওপরেও কি যেন ভারী জিনিষ পড়ার শব্দ হ'ল। দূরে চেয়ে দেখি, কুমীরটা এতক্ষণ যেখানে রোদ পোয়াচ্ছিল, সেখানে আর নেই। কুমীরটার বিশাল দেহটা একবার শুধু জলের ওপরে দেখা গেল। পরমুহূর্ত্তেই জলের তলায় সেটা অদৃশ্য হ'ল।

রামদার শত নিষেধ সত্ত্বেও আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা কথা,—"কি হবে রামদা!"

আমাকে ভয় না পেতে বলে রামদা লাফিয়ে পড়লেন বন্ধুটির কাছে। তারপরে বন্ধুর দেহের দু'দিকে পা রেখে হাঁটু গেড়ে তিনি যেন কিসের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর সেই চ্যালেঞ্জের ভাব আমি কোনদিন ভুলবো না। তাঁর মুখে যেন ফুটে উঠেছিল,—আমাকে না মেরে আমার বন্ধুর কেশাগ্র স্পর্শ করবার ক্ষমতা কারুর নেই!

ঠিক এমনি সময় কুমীরটা এসে তার লেজের ঝাপটা মারলো পাড়ের ওপর! সেই ঝাপটায় অনেকখানি পাড় ভেঙে জলে পড়লো। আমাদের গাছটাও থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠলো!

সুযোগ বুঝে বাঘ মহারাজও দিলেন এক লাফ! সোজা একেবারে রামদার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়াই তার লক্ষ্য! কী ভয়ানক দৃশ্য। এখুনি বাঘটা সজোরে এসে পড়বে রামদার ঘাড়ের ওপর! তারপর······

আমি আর চেয়ে দেখতে পারলাম না—ভয়ে চোখ বন্ধ ক'রে ফেললাম।

—গুড়ুম—গুড়ুম—

বন্দুকের আওয়াজ শুনে মনের মধ্যে আবার সাহস এলো। তাহ'লে রামদাকে বাঘ মারতে পারেনি! চেয়ে দেখি খালের মাঝামাঝি জায়গায় এসে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে একবার গর্জ্জন ক'রে উঠলো বাঘটা। তারপরই ঝপাৎ ক'রে গিয়ে পড়লো জলের মধ্যেই!

বিশ্রী কালো কালো কয়েকটি হিংস্র মুখ বাঘটির দেহ ঘিরে জলের ওপর ভেসে উঠলো, তারপর বাঘটার মৃতদেহ নিয়ে তারা জলের তলায় ডুব দিল।

আবার গর্জ্জে উঠলো রামদার বন্দুক ! এক ঝলক আগুন গিয়ে সাপটার সমস্ত আস্ফালন থামিয়ে দিল।

আমাকে নেমে আসবার জন্য ইসারা জানিয়ে রামদা ছোট ছেলের মত কোলে তুলে নিলেন তাঁর বন্ধুকে। তারপর সেখান থেকে খানিকটা সরে এসে তাকে শুইয়ে দিলেন ঘাসের ওপর।

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে একবার গর্জ্জন ক'রে উঠলো বাঘটা [পৃঃ ২০৩

ততক্ষণে আমিও গাছ থেকে নেমে এসেছি। কিছুক্ষণ দুজনার শুশ্রূষার ফলেই রামদার বন্ধু চোখ মেলে চাইলেন। খানিকটা গরম চা তাঁর মুখে ঢেলে দিতে দিতে রামদা বললেন,—"কি রকম ব্যাপার, আর বাঘ শিকার করতে আসবে ?"

অস্তমিত সূর্য্যের শেষ আলোয় আমরা যাত্রা সুরু করলাম গ্রামের দিকে।

গ্রামের লোকেরা যখন জানতে পারলো যে, রামদা তাদের সেই মহাশত্রু বাঘটাকে মেরে ফেলেছে, তখন তাদের সে কী আনন্দ ! আর এর পর আমি যে আর কোনদিন শিকারে গিয়ে বাহাদুরি দেখাতে চেষ্টা করিনি সে-কথা অবশ্য আজ আর স্বীকার করতে বাধা নেই !

সান্ত্বনা

—শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ

মাগো এমন বদ্ধ ঘরে আর কি লাগে ভালো,
কতকাল যে দেখিনি ওই আকাশভরা আলো।
শিয়রের ঐ জানলাটারে
বন্ধ ক'রে রাখিস্ নারে,
দু'চোখ মেলে দেখ্‌ব আমি বিশ্বজোড়া আলো,
এই বুকেতে তলিয়ে আছে জমাট-করা কালো।

আচ্ছা মাগো, জানলাটারে দিলি নাতো খুলে,
বারেক তবে জড়িয়ে বুকে ধর্ না আমায় তুলে।
ওই যে দূরের সুনীল আকাশ,
হান্‌বে চোখে রঙের আভাস।
রঙ-বেরঙের খেলা তাহার সবি গেছি ভুলে,
শুধু বারেক দুহাত দিয়ে ধর্ না আমায় তুলে।

আচ্ছা মাগো, উঠোন কোণের সেই যে চাঁপা গাছে,
শাখা ছিল ফুলে ভরা আজও কি তা আছে?
আমার মত এমনি ক'রে
যায়নি সে তো শুকিয়ে ঝরে,
নীল গগনের উদার আলো তাহার চোখে নাচে?
চোখ জুড়ানো সবুজ পাতার সাজ কি আজো আছে?

বল্‌না মাগো কি মাস এটা, বল্ না সত্যি ক'রে
এমন সময় আকুল বকুল পড়ত ঝ'রে ঝ'রে।
তাই তো মাগো শুধাই তোরে,
ঝরছে কি ফুল আজকে ভোরে
রুদ্ধ ঘরে আঘাত হেনে গন্ধ কেঁদে মরে,
আকাশ বাতাস আকুল হ'য়ে কাঁদে আমার তরে।

যতন ক'রে গুছিয়ে রাখিস্ আমার খেলাঘর
ভাঙ্গতে যেন না পারে মা দুষ্টু মেঠো ঝড়।
আমায় ছোট্ট পড়ার ঘরে
রেখেছিলে বন্ধ ক'রে ;
বাকী পড়া সারব আমি হলে অবসর,
যতন ক'রে গুছিয়ে রাখিস্ আমার খেলাঘর।

আজকে ভোরে তোমার চোখে ঝরছে কেন জল ?
বল্ না মাগো কি হয়েছে সত্যি ক'রে বল।
বুকে আমায় জড়িয়ে ধ'রে
ভাবছ, খোকা যাবেই মরে
ডাক্তারেতে কি ব'লেছে বল্ মা খুলে বল,
কাঁদিস কেন মিছামিছি ফেল্ না মুছে জল।

বল্ না মাগো মরব আমি এতই তাড়াতাড়ি ?
সত্যি কি মা এতই সহজ মোদের ছাড়াছাড়ি ?
ঐ যে দূরের সুনীল আকাশ
গন্ধে ভরা এই যে বাতাস
এদের ছেড়ে অচিন দেশে কেমনে দেব পাড়ি ?
কেমন ক'রে যাব মাগো তোমায় আমি ছাড়ি ?

না মাগো না, তা' হবে না, বাঁচতে আমায় হবেই
বাকী কাজ শেষ হলে ছুটি আমার তবেই।
ভাল হয়ে তেমনি ক'রে
বসব তোমার কোলটি জুড়ে।
ঐ কোলটি স্নেহমাখা আমার তরে রবেই
থাকি আমি নাই বা থাকি আমার তুমি রবেই।

ইস্কাবনের টেক্কা

—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

[**পূর্ব্বকথা**। অনিতা সেন গরীবের মেয়ে, টাইপিষ্টের কাজ করে। তার অফিসের সেক্রেটারী দামোদর চাটুজ্যির অনুরোধে সে একদিন তাঁকে হাতে এঁকে দিয়েছিল একটা 'ইস্কাবনের টেক্কা'। পরে জানতে পারলো এই ইস্কাবনের টেক্কা হ'চ্ছে এক ডাকাতদলের প্রতীক চিহ্ন। তাদের ডাকাতির নোটিশ ; মৃত্যুর অমোঘ পরোয়ানা। ......দামোদর কি ডাকাত ? খুনী ? এসব কথা পুলিশকে জানাবে কি নমিতা ? কিন্তু ইতিমধ্যে সংবাদ আসে দামোদরবাবু নিজেই নাকি খুন হয়েছেন। ....হ্যাঁ, লাশ দামোদরবাবুরই বটে। পাতিপুকুরে গিয়ে লাশ সনাক্ত করে অফিসের সহকারী সেক্রেটারী অনিল মুখুজ্জে ; সাথে থাকে অনিতা আর তার অফিসের দু'জন সহকর্মী হীরু আর সমরেশ। ফেরবার পথে ট্যাক্সিওয়ালা সিংজী অনিতাকে বিনা খরচায় বাড়ী পৌঁছে দেবার আগ্রহ দেখায়, কিন্তু অনিতা প্রত্যাখ্যান করে তাকে। হীরু আর সমরেশ অনিলবাবুর কথায় তাঁর পরিচিত এক গাড়ীতে ওঠে আর অনিতা হেঁটেই বাড়ী ফেরে। কিন্তু বাড়ীর কাছাকাছি গলির মুখে স্বরাজ হোটেলের সামনে সেই বিনয়ের অবতার ট্যাক্সিওয়ালা সিংজী ওভাবে গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে কেন ? দু'টো সিংজী যে ! সন্দেহ হয় অনিতার। কি মতলব ওদের ?......কাছেই পাড়ার ছেলে অবিনাশের দোকান। তাকে সব বলতে সে তার দলবল নিয়ে রীতিমত লড়াই ক'রে ধরে ফেলে সিংজী দু'জনকে। কিন্তু ওদের রিভলভারের গুলিতে সাংঘাতিক ভাবে আহত হয় ওদের দলের ছেলে রমাই সাণ্ডেল।]

তিন

রামপুকুর থানার সহকারী দারোগা শৈলেশ। তদন্তের জন্য ইনস্পেক্টর তাকেই পাঠালেন। সিনিয়র অফিসাররা সবাই অন্য কাজে ব্যস্ত।

সব দেখে শুনে সিংজীদের থানায় পাঠালো শৈলেশ, রমাইকে পাঠালো হাসপাতালে। অবিনাশের দলবল—যারা হল্লায় যোগ দিয়েছিল, তাদের নামধাম লিখে পরদিন দশটায় থানায় হাজিরা দিতে বলল। আর স্বরাজ হোটেলের টেবিল চেয়ার রাস্তার উপর থেকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিল দোকানের ভিতরকার কামরাতে।

হোটেলের ম্যানেজার চোখ রাঙিয়ে বলে—"আপনি এসব সরাবার কে ? জানেন, আমি উপরওয়ালাদের হুকুম নিয়েছি ?"

"দেখান হুকুম !"—বললে শৈলেশ। "লিখিত হুকুম যদি থাকে, আপনার টেবিল চেয়ার আমি আবার নিজের হাতে রাস্তায় সাজিয়ে দিয়ে যাব। মৌখিক হুকুম মানি নে আমি।"

"দেখে নেব, আপনাকে মানতে হয় কিনা!"—দাঁতে দাঁত ঘষে জবাব দিলে ম্যানেজার।

শৈলেশ আর কান দিলে না সে-কথায়। অবিনাশকে বলল—"যে মহিলাকে নিয়ে গোলমালের সুরু, তাঁর সঙ্গে এইবার কথা কইব।"

"তাঁকে ত' বাড়ী রেখে এসেছি গোলমাল থামতেই। বলেন ত' সেখানে নিয়ে যেতে পারি আপনাকে।"—বললে অবিনাশ।

একটু চিন্তা করল শৈলেশ। রাত দশটা প্রায়। শ্রান্ত ক্লান্ত মেয়েটিকে এখন আবার বিরক্ত করতে যাবে? হল্লা ত' থেমেছে! যারা দোষী, তারা ত' পুলিশের হেফাজতে! তবে ওকে আর এখনই টানাটানি করা কেন?

কাল সকালে জবানবন্দী নিলেই ত' হবে!

উহুঁ—নাঃ! তা হবে না। শৈলেশ বেশ ক'রে ভেবে দেখল, তাতে অসুবিধা ঘটতে পারে। একটা রাত্রিতে অনেক-কিছুই ঘটতে পারে কলকাতা সহরে। এমনও হ'তে পারে যে মেয়েটি উধাও হয়ে যাবে রাতারাতি। ওকে ফাঁদে ফেলবার জন্য সত্যই যদি কেউ চেষ্টা ক'রে থাকে; সে যে এই রাত্রিতেই আবারও চেষ্টা করবে না, তা কে জানে? আর, চেষ্টা যদি করেই, এবারে যে সে সফল হবে না, তা-ই বা কে বলতে পারে? নাঃ, এখুনি তার কাছে যাওয়া চাই।

অবিনাশকে নিয়ে শৈলেশ চলল।

কড়া নাড়তেই অনিতা নেমে এল নিজেই। সমুখের বাড়ীর খোলা জানালা দিয়ে জোর আলো এসে পড়েছিল তার মুখের উপর, তাইতে শৈলেশ দেখল—মেয়েটির মুখে ক্লান্তির চেয়ে ভয়ের আভাস যেন বেশী। বিপদ যা ঘটতে পারত, তা ত' ঘটেনি! তবে? শৈলেশ ভাবল, এখনও এত ভয়ের কারণ কী এর?

নমস্কার আদানপ্রদানের পর শৈলেশ জিজ্ঞাসা করল—"আপনার এখানে বসবার জায়গা হবে ত'? কিছু মনে করবেন না, কলকাতার ভাড়াবাড়ীতে অনেক সময়েই তা থাকে না। ধরুন, আমারই নেই।"

এই ব'লে শৈলেশ নিজেও হাসল, তার সঙ্গে অবিনাশও হাসল। অনিতারও ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক খেলে গেল একটু।

"নিরিবিলিতে যদি কথা কইতে হয়, এখন তবে একমাত্র জায়গা রান্নার চাতাল।"—গম্ভীর হয়ে উত্তর করল অনিতা। "আমার শোবার ঘরে ছোট বোন ঘুমিয়ে পড়েছে, রাত্রে সে আমার সঙ্গেই শোয়। আর মায়ের শোবার ঘরে—"

"থাক্, থাক্, রান্নার চাতালেই বসবো আমরা। পিঁড়ে থাকে ত' বহুৎ আচ্ছা, না থাকলে বেতের আসন বা কাপড়ের-পাড়-জোড়া-দেওয়া আসন—চলুন, পথ দেখান!

বিনাশবাবু আসুন। আপনি পাড়ার ছেলে, আপনি উপস্থিত থাকলে ইনি সাহস পাবেন হয়ত।”

*　　*　　*　　*

কথাবার্ত্তা শেষ হ’তে আধ ঘণ্টার বেশী লাগেনি। অনিতার রান্নাঘর থেকে শৈলেশ আর অবিনাশ যখন বেরিয়ে এল, রাত তখন সাড়ে দশটা হবে। শৈলেশের মুখে চিন্তার ছাপ ; রাস্তার একটা অন্ধকার কোণ বেছে নিয়ে সে দাঁড়াল অবিনাশের সঙ্গে। “শুনুন অবিনাশবাবু, ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো মনে হচ্ছে”—বলল সে।

অবিনাশ সায় দিল—“নিশ্চয়! দামোদর ভট্‌চাজ্যির হত্যার পিঠ-পিঠ তাঁর অফিসের লেডী-টাইপিষ্টকে সরাবার এই চেষ্টা—”

“দু’টোর ভিতর যোগসূত্র কোথায়, তা এখনও ধরতে পারছি না যদিও, তবে যোগসূত্র একটা আছে বলেই ত’ মনে হয়। তা যদি থাকে, তবে ষড়যন্ত্রটা ছোট নয়, এটা ধ’রে নিতে পারি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন একটু।”

উৎসাহের সঙ্গে বলল অবিনাশ—“কি করতে হবে বলুন।”

“আমি থানায় গিয়ে রিপোর্ট দিচ্ছি। এবং ইনস্পেক্টরের অনুমতি নিয়ে পাহারা বসাচ্ছি এই বাড়ীতে। যতক্ষণ পাহারা না আসে, আপনি আশে-পাশে থাকবেন!”

“তা নিশ্চয়ই থাকব”—ঝটিতি উত্তর দিল অবিনাশ। “কিন্তু ধরুন যদি সন্দেহ-জনক লোকজন দেখতে পাই, তখন আমার কর্ত্তব্য হবে কি?”

“তাদের উপর লক্ষ্য রাখা, এবং তাদের অত্যাচার থেকে অনিতাদেবীকে রক্ষা করা। আমার যতদূর মনে হয়, এই রাত্রিতেই সিংজীর সহকর্ম্মীরা আর একটা চেষ্টা করবে অনিতাদেবীকে ধ’রে নিয়ে যাবার। অল্পে নিরস্ত হবার পাত্র যে ওরা নয়, তার প্রমাণ ত’ হাতে-হাতেই পাওয়া গেছে! রমাই সাণ্ডেলকে যেভাবে গুলি করেছে, তাতে বেচারীর প্রাণটা বাঁচবে কি না, সন্দেহ আছে।”

অবিনাশ রইল রাস্তার অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে। শৈলেশ গিয়ে এত্তেলা দিল ইন্দুবাবুর কাছে। ইন্দুবাবুই থানার চার্জ্জে আছেন, প্রবীণ ইনস্পেক্টর তিনি।

সব শুনে ইন্দুবাবু হাসলেন।

“যোগসূত্র-? থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু আছেই যে, তা ধ’রে নেবার মত তথ্য তোমার হাতে কই? দামোদরের লাশ সনাক্ত করতে এই মেয়েটি গিয়েছিল। আসবার সময় ট্যাক্সিতে এসেছে অন্য সহকর্ম্মীদের সঙ্গে। এই ড্রাইভার লোকটা তাকে দেখেই চুরি করবার ফন্দী এঁটেছে। এমনও হ’তে পারে যে, আগে থেকেই সে মেয়েটিকে চিনত। ঐ দিকেই যদি তার গ্যারেজ হয়, তা হ’লে চেনা খুবই সম্ভব। এসব লোক মরিয়া হয়। গাড়ী দিয়ে রাস্তা আটক ক’রে অনিতাকে জোর ক’রে গাড়ীতে

তুলে নিয়ে পালানোর মতলব, এবং পরে বাধা পেয়ে পালানোর উদ্দেশ্যে সরাসরি গুলি চালানো—এসব সেই মরিয়া স্বভাবেরই পরিচয়। নাঃ—দামোদরের খুনের সঙ্গে এই ব্যাপারকে জড়িয়ে তোলার স্বপক্ষে কোন কারণ আমি দেখতে পাই না এখন পর্য্যন্ত।"

কথা শেষ ক'রে চুরুট ধরালেন ইন্দুবাবু।

ইন্দুবাবুর সঙ্গে যাদের কাজকারবার করতে হয়, তারা জানে যে তাঁর এই চুরুট ধরানো একটা অর্থপূর্ণ ব্যাপার। সে অর্থ হ'ল এই যে, পূর্ব্বের প্রসঙ্গের উপর পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়েছেন ইন্দুবাবু। ও-সম্বন্ধে আর কোনো আলোচনা করতে তিনি নারাজ। তবু একবার সাহস ক'রে সে বলল—"মিস্ সেনের বাড়ীতে পাহারা বসানো—অর্থাৎ রাত্রে আবার যদি তাঁর কোন বিপদ ঘটে—"

"কে ঘটাবে?"—মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে বিরক্তভাবে ইন্দুবাবু বললেন—"বলি, ঘটাবে কে? তোমার সে ড্রাইভার আর তার সেই সঙ্গী দু'টোই ত' হাজতে। হাজত ভেঙ্গে পালাতে না পারলে ত' আর তারা মিস্ সেনের বাড়ীতে হামলা করতে পারছে না!"

শৈলেশ আর কথা বাড়ানো সঙ্গত মনে করল না। ভয়ানক একগুঁয়ে লোক এই ইন্দুবাবু। শৈলেশের মত একটা জুনিয়ারের কথায় তিনি মত পরিবর্ত্তন করবেন, এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। লাভের মধ্যে তিনি হয়ত রীতিমত রেগে যাবেন শৈলেশের উপর।

রাত বারোটা পর্য্যন্ত শৈলেশের ডিউটি। থানার পিছনেই পায়রার খুপরির মত কোয়ার্টার আছে তার। ডিউটির পর সেইখানেই তার থাকবার কথা। কিন্তু তা সে রইল না। নিকটের এক হোটেলওয়ালা রাত্রে তার ঘরে রুটি তরকারি চাপা দিয়ে রেখে যায়, ডিউটির পর এক ভাগ নিজে খেয়ে, বাকি ভাগটা খবরের কাগজে জড়িয়ে হাতে নিল। বেচারী অবিনাশের খাওয়া হয়নি নিশ্চয়।

থানার সুমুখে সঙ্গীন হাতে পাহারাওয়ালা। তাকে শৈলেশ বলল—"আমি কাজে বেরুচ্ছি তেওয়ারিজি! এখন আমার ডিউটি নয় বটে, তবু খোঁজ হ'তে পারে। হয় যদি তবে—"

"ঠিক হ্যায়, বাবুজি!"—জবাব দিলে পাহারাওয়ালা।

আরও ঘণ্টা দুই বাদে!

ইন্দুবাবু তাঁর সাত-ফুট-লম্বা পালঙ্কে চিৎপাত হয়ে শুয়েছিলেন; হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল মাথার কাছে। শুয়ে শুয়েই হাত বাড়িয়ে রিসিভার ধরলেন তিনি। এ-রকম ঘুমের ব্যাঘাত তাঁর নিত্যই হয়, কাজেই হঠাৎ আর ওতে চঞ্চল হন না।

আজ কিন্তু রিসিভার কানে ধ'রেই তিনি ধড়মড় ক'রে উঠে বসলেন—"হ্যাঁ, সার! আমি ইন্দু! বলুন, বলুন!"

লাইনের ও-মাথায় গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার।

দুই মিনিটের ভিতরেই টেলিফোন রেখে শয্যা ত্যাগ করলেন ইন্দুবাবু। পায়জামা প'রেই জোর-পায়ে অফিসঘরে ছুটলেন! "পাহারা! শৈলেশবাবুকো বোলাও!"—হুকুম করলেন চেয়ারে বসবার আগেই।

"শৈলীশ বাবু?"—পাহারাওয়ালা দরজায় দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকল কর্ত্তাকে। "শৈলীশ বাবু ত বারো বাজে কা থোড়া বাদ বাহার গয়া হুজুর! বোলা কি কুছ্ কাম মে যাতা!"

"কাম মে?—ড্যাম্!"—ইন্দুবাবুর হঠাৎই রাগ হয়ে গেল। "কে, নীরদ? তোমার বুঝি ডিউটি?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ!"—উত্তর দিলেন আধাবয়সী এক দারোগা।

"দেখ ভাই ঝামেলা! শীগ্‌গির ডজন খানেক সেপাই নিয়ে, এবং কামান বন্দুক ঘোড়া গাড়ী যা কিছু আছে থানায়, সব নিয়ে, ঐ অনিতা সেনের বাড়ীতে যাও দেখি!"

"অনিতা সেনের বাড়ী?"—খাতা খুলে ঠিকানা খুঁজতে লাগলেন নীরদবাবু। "এই যে, শৈলেশ সেখানে গিয়েছিল দেখছি!"

"তোমাকেও যেতে হবে। গিয়ে দেখতে হবে, সে বহাল-তবিয়তে বাড়ীতে আছে, না নিরুদ্দেশ হয়েছে!"

"নিরুদ্দেশ?"—অবাক হলেন নীরদবাবু।

"হ্যাঁ, নিরুদ্দেশ! দামোদর ভট্‌চাজ্যির লাশ—সেই যে পাতিপুকুরের ওদিকটায় লাশটা পাওয়া গিয়েছিল কাল সকালে—সেই লাশ সনাক্ত করবার জন্য চারজন যায়। তিনটি পুরুষ, একটি নারী অর্থাৎ ঐ অনিতা সেন। পুরুষ তিনটি সারারাত বাড়ী ফেরেনি; তাদের আপনার লোকেরা হাসপাতাল আর থানা চষে বেড়াচ্ছে সারারাত।"

নীরদবাবু লোকজন নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পাঁচ মিনিটের ভেতরই। ইন্দুবাবু চেয়ারে বসে টেবিলের উপর থেকে পেন্‌সিলটা তুলে মুখে পূরলেন। হিংস্রভাবে কামড়াতে সুরু করলেন সেটা। দুধের ছোকরা শৈলেশ যে দু'ঘণ্টা আগেই অনিতার সম্বন্ধে আশঙ্কা জানিয়েছিল তাঁর কাছে, একথা টেলিফোনে ডেপুটি সাহেবকে বলা হয়নি। বলার সময় ছিল না, একথা ঠিক। কিন্তু সময় থাকলেও কি তিনি বলতে পারতেন? একথা বলা, আর নিজের হাতে নিজে কানমলা খাওয়া যে ইন্দুবাবুর পক্ষে একই কথা! ছিঃ ছিঃ ছিঃ, একরত্তি একটা জুনিয়ারের মাথায় যে-বুদ্ধি আছে, এমন

একটা ঝানু ইনস্পেক্টর তিনি—তাঁর মাথায় তা নেই ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ, ডেপুটি সাহেব ভাববেন কী ?

যা-ই ভাবুন, বলতে কিন্তু হবেই। লজ্জায় মাথা কাটা গেলেও বলতে হবে। নীরদবাবু ফিরে এলেই ডেপুটি সাহেবকে ফোন করার কথা। সেই সময় ডেপুটি সাহেবকে ও-কথাটা বলতেই হবে। বলতেই হবে যে তিনি একটা আকাট মূর্খ, তাঁর চেয়ে বেশী বুদ্ধি রাখে তাঁরই অধীনস্থ সহকারী দারোগা—শৈলেশ মিত্তির তার নাম।

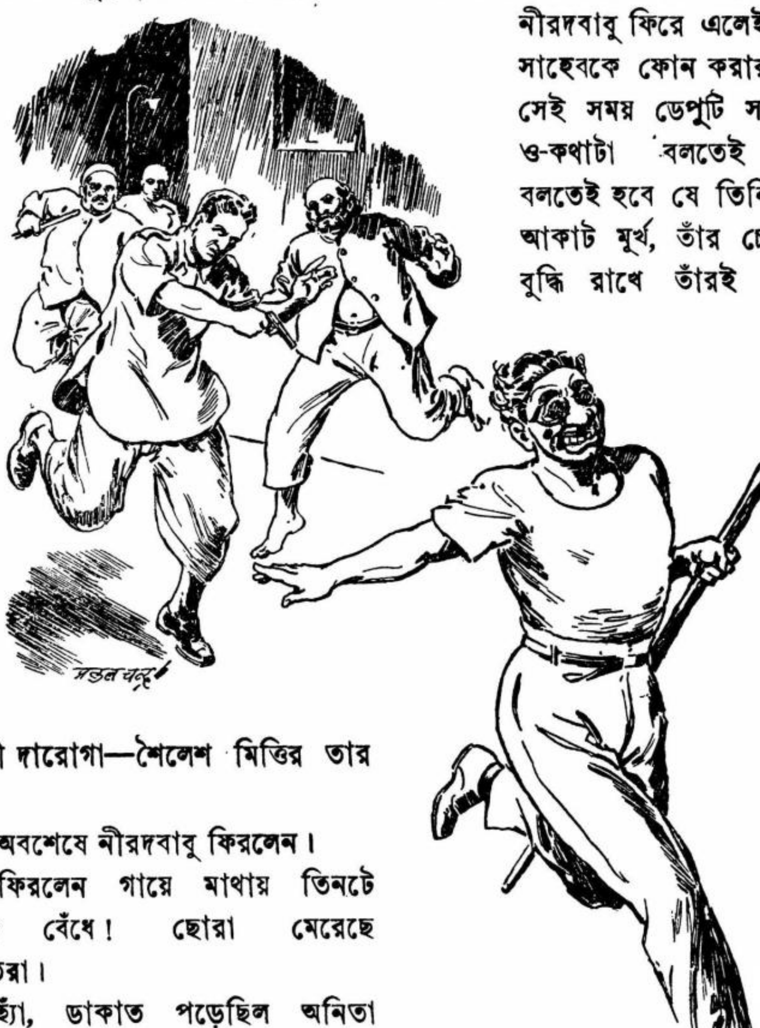

শৈলেশ ছুটল ডাকাতের পিছন পিছন পিস্তল ছুঁড়তে ছুঁড়তে [পৃঃ ২১৩

অবশেষে নীরদবাবু ফিরলেন।

ফিরলেন গায়ে মাথায় তিনটে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে! ছোরা মেরেছে ডাকাতেরা।

হ্যাঁ, ডাকাত পড়েছিল অনিতা সেনের বাড়ীতে। অবিনাশ ব'লে পাড়ার একটি ছেলেকে নিয়ে শৈলেশ বাধা দেয় তাদের। পাড়ার অন্য লোকও পরে জুটেছিল, সোরগোল শুনে। অবিনাশ একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ডাকাতগুলোকে

ঘটেছিল। শৈলেশ চালিয়েছিল পিস্তল। কিন্তু শেষ রক্ষা হ'ত না, যদি-না নীরদবাবুর দলবল গিয়ে পড়ত। খুব সময়েই গিয়ে পড়েছিলেন নীরদবাবু। আর পাঁচ মিনিট দেরী হ'লে অনিতাকে নিয়ে পালাত তারা।

অনিতাকে গাড়ীতে ক'রে থানায় আনা হয়েছে। অবিনাশকেও। অবিনাশও নীরদবাবুরই মত আহত। কিন্তু শৈলেশ? শৈলেশকে নীরদবাবু দেখেছেন। একটা মুখোশ-পরা ডাকাতের সঙ্গে হাতাহাতি-লড়াই চলছিল তার। ডাকাতটা শৈলেশের হাত ছাড়িয়ে পালাল; শৈলেশ ছুটল পিছন পিছন পিস্তল ছুঁড়তে ছুঁড়তে। তারপর শৈলেশকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

নীরদবাবু চারজন লোক রেখে এসেছেন শৈলেশকে খুঁজবার জন্য। নিজে খুবই জখম ব'লে চলে আসতে হয়েছে তাঁকে। ডাকাতেরা?—তারা সবাই পালিয়েছে; তাদের গাড়ী ছিল নিকটেই কোথাও। গাড়ীর শব্দ শোনা গিয়েছিল।

শৈলেশকে তারা গাড়ীতে ক'রে ধ'রে নিয়ে যায়নি ত'?—তার আটক কি? দিতে পারে নিশ্চয়ই। ওরা ত' দলে ভারীও ছিল, লোকও সব বেপরোয়া!

[ক্রমশঃ

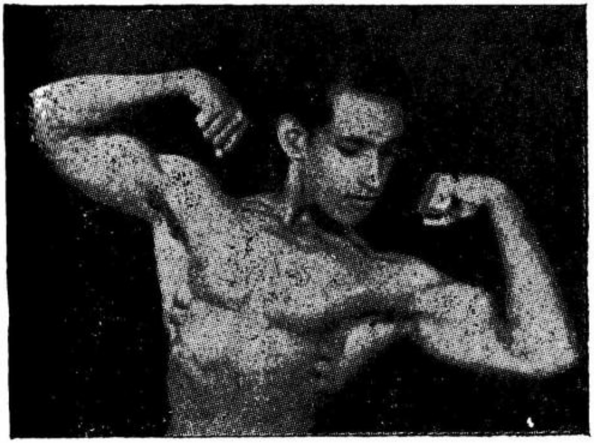

শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ দেব

● ব্যায়াম বিজ্ঞানী

'স্বাস্থ্যই সম্পদ' প্রবাদটি কেবল কথা নয়—যার স্বাস্থ্য আছে, রোগ, ডাক্তার তার কাছ থেকে অনেকদূরে চলে গেছে। পাশের ছবিতে আমরা তেমনি একটি লোককে দেখতে পাচ্ছি। এঁর নাম শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ দেব। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় ইনি বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। একটু চেষ্টা করলে তোমরাও এঁর মত স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারো। তখন এই পৃথিবী তোমাদের চোখে কত সুন্দর হয়েই না ফুটবে!

আশা-পরী

—দীপেন সেনগু[প্ত]

অনেক অনেক সকাল, অনেক অনেক দিন, অনেক অনেক রাত ধরে পৃথিবী ঘুরছে। ক[ত] মানুষ তার বুকে এল—চলে গেল। পৃথিবী তাদের সবাইকে দেখেছে। আজ তার বয়স অনেক! আজও সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে—মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, দুঃখ পাচ্ছে, ব্যথা পাচ্ছে। মানুষের মধ্যে আজ জটিলতা, ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ। তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ো পৃথিবী।

চিরদিনই কিন্তু এমনটি ছিল না। আগে, যখন আজকের পৃথিবীর বয়স ছিল অল্প, সে নিজের আনন্দে ঘুরত, দুঃখ বলে কিছু জানত না। মানুষও জানত না সেদিন ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা। কিন্তু তারপর কি ক'রে সমস্ত পৃথিবীতে নেমে এল অশান্তি, সেই গল্পই বলছি শোনো—।

পৃথিবীর সেই অল্প বয়সের দিনের কথা।

এক দেশে একটি ছেলে বাস করতো। তার কোন নাম ছিল না, তার বাবা-মা কেউ না থাকায় তাকে কেউ কোনো নামই দেয়নি। সে একা থাকতো বলে, দূর দেশ থেকে একটি ছোট মেয়ে তার সঙ্গে থাকতে এল। পৃথিবীতে মেয়েটিরও কেউ ছিল না। লোকে তাকে 'প্যাণ্ডোরা' বলে ডাকতো। ওদের ভালই হলো। ওরা দুজনেই দুজনের বন্ধু হলো, খেলার সঙ্গী হলো।

প্রথম যেদিন প্যাণ্ডোরা ছেলেটির কুঁড়েঘরে এল, সেইদিনই একটা জিনিষ তার নজরে পড়ল—একটা ছোট্ট কাঠের বাক্স।

প্যাণ্ডোরা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা না ক'রে পারল না: "ঐ বাক্সটাতে তোমার কী আছে?"

ছেলেটি একটু আমতা আমতা ক'রে বলে: "ও একটা গোপনীয় ব্যাপার। আমাকে ওটা যত্ন ক'রে রাখতে দেওয়া হয়েছে। আমি রেখে দিয়েছি—ব্যস্। এর বেশী আমিও কিছু জানি না, আর তুমিও এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না আমায়।"

মেয়েটি কিন্তু এই ছোট্ট জবাবে খুশী হতে পারল না। সে আবারও প্রশ্ন করল: "বাঃ! বাক্সটা কে দিল আর কোত্থেকেই বা এল?"

ছেলেটি গম্ভীর হয়ে বলে: "সে কথাও বলতে বারণ।" প্যাণ্ডোরা এবার বিরক্ত হয়, শেষে বলে। "দুত্তোর! আমি ঐ নোংরা বাক্সটাকে দূর ক'রে দেব। একটা অকেজো জিনিষ প'ড়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে।"—বলেই সে ভ্রূ কুঁচকে লক্ষ্য করে ছেলেটিকে।

ছেলেটি নানা কথা বলে চাপা দিতে চায় ব্যাপারটি। শেষে সে বলে: "খেলার দেরী হয়ে যাচ্ছে, চল। ঐ বাক্সটার কথা অত না ভাবলেও চলবে।"

প্যাণ্ডোরা তখনকার মত বাক্সটার কথা ভুলে, খেলতে চলে গেল।

বাড়ী ফিরেই, সে আবার গিয়ে দাঁড়াল বাক্সের সামনে। অনেকটা নিজের মনেই বলে: "কী এমন থাকতে পারে? কেই বা আনল এটাকে?"

তারপর ছেলেটির দিকে ফিরে অনুনয় ক'রে বলে: "আচ্ছা একটুখানি বলই না! ওটার সম্বন্ধে জানতে না পারলে, আমার যে ভাল লাগছে না।"

ছেলেটি বোঝে প্যাণ্ডোরার কৌতূহল খুব বেশী। তাই সে বোঝাবার জন্যে মাথা নেড়ে বলে: আমি তোমার চেয়ে এক বিন্দুও বেশী জানি না, প্যাণ্ডোরা! বিশ্বাস কর।"

প্যাণ্ডোরাও নাছোড়বান্দা: "বেশ, তাহলে তুমি ত' এটা খুলতে পারো। আর আমরাও দু'জনে দেখে নিতে পারি এটার মধ্যে কী আছে?"

বাক্সটি খুলতে বলায় ছেলেটি সাপ দেখার মত যেন চম্‌কে উঠল।—সে কী ক'রে হয়? বাক্সটা যে একজন তাকে বিশ্বাস ক'রে রাখতে দিয়েছে! বলে কী মেয়েটা?

তার মুখ দেখে বুঝতে পারল প্যাণ্ডোরা যে, খুলতে রাজী নয় ও। তাই বাক্স খুলতে বলার আর সাহস না পেয়ে সে বল্লে: "যাক্‌গে, নাইবা খুললে। কিন্তু বাক্সটা কেমন ক'রে পেলে, সে কথাও বললে কী দোষের?"

কিছুক্ষণ ছেলেটি চুপ ক'রে কী যেন ভাবে। তারপর আস্তে আস্তে বলে: "তুমি আসার কিছুক্ষণ আগে একটা লোক বাক্সটাকে নিয়ে আমার দোরগোড়ায় এসে বসেছিল। অদ্ভুত ধরণের তার সাজ-পোষাক। গায়ের জামাটা ধোঁয়াটে রংয়ের, মাথায় একটা টুপি, টুপির অর্দ্ধেকটা পালকের তৈরী। তার আবার পাখীর মত দু'টো ডানা আছে।"

মেয়েটি তার ঔৎসুক্যভরা চোখ দু'টো কুঁচকে বলে: "তার চেহারাটা কেমন বল দেখি?"

—"ওঃ সে এক অদ্ভুত চেহারা। আমার মনে হয়, সে রকম চেহারা তুমি জীবনে দেখনি। তার চেহারাটা দেখলে তোমার মনে হবে যেন দুটো সাপ একটা লাঠির গায়ে পেঁচিয়ে উঠেছে।"

প্যাণ্ডোরা বলে: "হুঁ! তাকে আমি চিনেছি। এ নিশ্চয় মার্কারি দেবতা। সেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। আর তাহলে বাক্সটাকেও রেখে গেছে আমার জন্যে। ওটার মধ্যে নিশ্চয় আমার জামাকাপড় রয়েছে, আর রয়েছে দু'জনের খেলনা।"

ছেলেটি নিস্পৃহের মত উত্তর দেয়: "তা হবে। কিন্তু মার্কারি যতক্ষণ না নিজে এসে বাক্সটাকে খুলতে বলছেন, ততক্ষণ আমাদের কারুরই কোন অধিকার নেই ওটা খোলার।" এই বলে ছেলেটি কি কাজে বাইরে বেরিয়ে গেল।

প্যাণ্ডোরা আপন মনেই বলে: "ছেলেটা তো আচ্ছা বোকা! আর যেমন বোকা তেমনি ভীতু।" তারপর সে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বাক্সটাকে ভাল ভাবে লক্ষ্য করে। না, বাক্সটি তো মোটেই খারাপ নয়।—বেশ সুন্দরই তো! সে অবাক হয়ে দেখে, বাক্সটার গায়ে নানারকম কারুকার্য্য করা।

প্যাণ্ডোরা বাক্সটির দিকে আর একটু এগিয়ে গেল। সাধারণ বাক্সের মত কোন তালা-চাবি আটকানো নেই বাক্সটিতে। একটা সোনার দড়ি দিয়ে, এক অদ্ভুত ধরণের গিঁট দিয়ে বাক্সটিকে বেঁধে রাখা হয়েছে। প্যাণ্ডোরা ভীষণ অবাক হ'ল। এ-রকম অদ্ভুত ধরণের গিঁট বাঁধা সে জীবনে দেখেনি। এর শুরু বা শেষ খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল। অতি দক্ষ লোকও গিঁটটাকে খুলতে পারবে না।

প্যাণ্ডোরা খুব মনোযোগ দিয়ে বাক্সটাকে দেখতে লাগল। দড়ির গিঁটটায় হাত দিয়ে নাড়া-চাড়া করতে করতে আপন মনেই বলে ওঠে সে: "উঃ কি গিঁটরে! একটু চেষ্টা করলেই অবিশ্যি খোলা যাবে! একবারটি খুলে শুধু এই গিঁট বাঁধার ধরণটা শিখে নেব; তারপর দড়িটা আবার বেঁধে দিলেই চলবে। বাক্সটি খুলব না। বোকা ছেলেটা তাহলে ভীষণ রাগ করবে।"

যতবার সে দড়িটাকে দেখতে লাগল, ততবারই চলতে লাগল খোলার চেষ্টা। হাত দিয়ে ঘুরিয়ে

ফিরিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ মৃদু টান দিল সে দড়িটায়। সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজি ঘটে গেল যেন অমন শক্ত গিঁটটা খুলে গিয়ে দড়িটা আলগা হয়ে ঝুলে পড়ল বাক্সের গায়ে।

এবারে প্যাণ্ডোরা কিন্তু বেশ ভয় পেয়ে গেল,—এ আবার কী? কখনও এমনটা ত' হতে দেখিনি! ওটা আবার বাঁধতে পারব তো?

প্যাণ্ডোরা আস্তে আস্তে বাক্সের ঢাকনাটা তুলছে

সে দু' একবার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই দড়ির মুখ দু'টোকে ঠিকমত লাগাতে পারল না। এখন আর দড়িটাকে বাক্সের গায়ে জড়িয়ে, ফেলে রাখা ছাড়া উপায় নেই। ছেলেটা বাড়ী ফিরে এসে যা হয় করবে।

হঠাৎ এক দুষ্টুবুদ্ধি মাথায় এল তার,—ছেলেটা বাড়ী ফিরে যখন দড়িটা খোলা দেখবে, নিশ্চয় বুঝবে আমার কাজ। আর কী করেই বা তাকে বিশ্বাস করাব যে, বাক্সটা আমি খুলিনি। সে ভাবল,—তাহলে ও যখন বিশ্বাসই করবে না, তখন আর বাক্সটি খুলে উঁকি দিয়ে দেখতে দোষ কী? তারপর বাক্সের ঢাকনাটি ঠিকমত বন্ধ ক'রে রাখলেই চলবে।

ঠিক এই সময় ছেলেটিও এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। সে ইচ্ছে করলেই চেঁচিয়ে বারণ করতে পারত প্যাণ্ডোরাকে। কিন্তু তারও একটু দেখার লোভ হ'ল। সে ভাবল,—আমি ত' আর খুলিনি! যদি দোষ হয় ত' আমার হবে না। বাক্স সম্বন্ধে তারও কৌতূহল হ'ল,—সত্যি যদি কোন মূল্যবান্ জিনিষ পাওয়া যায় এর মধ্যে! দু'জনেই সমান ভাগ ক'রে নেবে তাহলে!

প্যাণ্ডোরা যেমন আস্তে আস্তে বাক্সের ঢাকনাটা তুলছে, সঙ্গে সঙ্গে অমনি কোত্থেকে ঘন কালো মেঘ এসে সূর্য্যকে ঢেকে ফেলছে। সমস্ত কুঁড়েঘরে নেমে আসছে রাতের অন্ধকার। আকাশে ঘন ঘন বাজ ডাকছে।

প্যাণ্ডোরা বাক্স খোলার উত্তেজনায় এমনই মশগুল ছিল যে, অন্যদিকে তাকাবার তার ফুরসৎ ছিল না। বাক্সের ঢাকনাটা তুলতেই—ভিতর থেকে ডানাওয়ালা একরকমের বড় বড় পোকা ফর্ ফর্ ক'রে বাইরে বেরিয়ে এসে ঘরময় উড়ে বেড়াতে লাগল। পরক্ষণেই ছেলেটি চীৎকার ক'রে

কেঁদে উঠল : "উঃ! জ্বলে গেল, জ্বলে গেল। আমাকে হুল ফুটিয়েছে, আমার সারা শরীর জ্বলে গেল। উঃ! প্যাণ্ডোরা, এ কী করলে তুমি? কেন ঐ ভয়ঙ্কর বাক্সটা খুললে?"

প্যাণ্ডোরার হাত কাঁপছিল, বাক্সের ঢাকনাটা, হাত থেকে পড়ে গেল সশব্দে! সে তাড়াতাড়ি ছেলেটার কাছে দৌড়ে দেখতে গেল, কী হয়েছে তার? কিন্তু ঘরের ঘন অন্ধকারের মধ্যে কিছুই সে দেখতে পাচ্ছিল না। যন্ত্রণায় ছেলেটা শুধু ঘরময় দাপাদাপি ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আর একটা শব্দও কানে আসছিল তার—যেন লক্ষ লক্ষ মৌমাছি ফর্ ফর্ ক'রে ঘরময় উড়ছে। হঠাৎ বিদ্যুতের এক ঝলকে সে দেখতে পেল, বাদুড়ের মত এক ধরণের প্রাণী। তাদের দু'টো ক'রে কালো কালো ডানা, পিছনে শুঁড় পাকানো এক রকমের লেজ, আর লেজের ডগায় মস্ত এক হুল। কি ভয়ঙ্কর, কি বিশ্রী!

প্যাণ্ডোরা ভাবল—এদেরই কোন একটা ছেলেটিকে কামড়েছে। কিন্তু তাকেও আর বেশীক্ষণ ভাবতে হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেও দাপাদাপি সুরু ক'রে দিল। তাকে একসঙ্গে দু'টো পোকায় কামড়েছে!

পোকাগুলো তাদের কুৎসিত ডানা মেলে প্যাণ্ডোরা আর ছেলেটার সারা গায়ে হুল ফুটিয়ে উড়ে বেড়াতে লাগল, আর গান গাইতে লাগল :

"পাখ্না মেলে নামবি চল্
নামবি চল্।
গভীর ঘন আঁধার নামে
সূর্য্য গেছে অস্তাচল—
নামবি চল্।
দুঃখ-শোকে, হিংসা-বিষে
ভরিয়ে বাতাস তিক্ত-শিসে
ডাকছে যে আজ আঁধারতল
নামবি চল্।"

গান শেষ হতে পোকাগুলো জানলা দিয়ে বাইরের দিকে উড়ে চলে গেল। ওদের কানে এসে পৌঁছয় গানের শেষের দু' কলি,—নামবি চল্, নামবি চল্। ওরা দু'জনে কাঁদে—সমস্ত গায়ে ওদের বিষ ঢেলে দিয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে দু'জনেই দু'জনের দিকে কুটিল দৃষ্টিতে তাকায়।

হঠাৎ তারা শুনতে পেল, বাক্সের ভিতর থেকে একটা শব্দ উঠছে। শব্দটা শুনে তাকিয়ে দেখে, ছোট্ট একটা হাত বাক্সের ভিতর থেকে ঢাকনাটা উপরে ঠেলে তোলার চেষ্টা করছে।

প্যাণ্ডোরা কাঁদতে কাঁদতেই জিজ্ঞেস করল : "কে? তুমি কে?"

বাক্সের ভিতর থেকে একটা মিষ্টি গলায় উত্তর এল : "ঢাকনা তুললেই দেখতে পাবে।"

কিন্তু এবারে আর ঢাকনা খুলতে সাহস হয় না প্যাণ্ডোরার। আড়চোখে সে ছেলেটাকে দেখে। ছেলেটা তখনও কেঁদে চলেছে।

প্যাণ্ডোরা এবার কাঁদো-কাঁদো স্বরে উত্তর দেয় : "না, আমি পারব না, আমার ভয় করছে। ঐ পোকাগুলো উড়ে গেল, ওদের হুলের ঘায়ে আমাদের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমরা ও বাক্স আর খুলব না।"

সেই মিষ্টি গলায় আবার উত্তর এল : "ওগো, আমি তাদের কেউ নই। তারা আমার বন্ধু নয়। এস প্যাণ্ডোরা, লক্ষ্মীটি আমাকে বাইরে বের কর।"

কণ্ঠস্বরটিতে এমন আশ্বাস ছিল, এমন মমতার সুর ছিল যে, ওরা না এগিয়ে পারল না। এবারে ছেলেটিই বাক্সের ঢাকনা খুললে।

ঢাকনা খুলতেই, রামধনু রঙা একজোড়া ঝলমলে পাখা নিয়ে বেরিয়ে এল ছোট্ট এক পরী। এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ঘর আলোয় ঝলমল ক'রে উঠল। সেই আলোয় ওরা দেখতে পেল, পরী ওদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি ক'রে হাসছে। তারপর পরীটি প্রথমে উড়ে গিয়ে দাঁড়াল ছেলেটির কাছে। কোমল হাত সে বুলিয়ে দিল ছেলেটির কপালে। ছেলেটির সমস্ত ব্যথা কষ্ট একমুহূর্ত্তে চলে গেল। তারপর পরী গিয়ে দাঁড়াল প্যাণ্ডোরার কাছে। প্যাণ্ডোরাকে কাছে টেনে নিয়ে তার কপালেও একটা চুমু দিল পরী। প্যাণ্ডোরারও মনে হ'ল তার দেহে বা মনে কোন ব্যথা, কোন কষ্ট নেই। ঠিক আগে যেমন ছিল, তেমনটি হয়ে গেছে যেন।

প্যাণ্ডোরা জিজ্ঞেস করে : "লক্ষ্মীটি পরী, বল তুমি কে?" পরী মৃদু হেসে বলে : "আমি আশা। আমি দুঃখের পিছন পিছন ফিরি। তোমরা যখন ডাকো, তখনই ত' আর থাকতে পারি না।"

ছেলেটি এতক্ষণে জিজ্ঞেস করে : "আচ্ছা ঐ যে কতকগুলো বিশ্রী পোকা আমাদের কামড়ে দিয়ে গেল, ওরা কারা? কোথেকেই বা এল ওরা? আমরা তো ওদের এই বাক্স থেকে মুক্তি দিলাম, তবু ওরা আমাদের কামড়ে গেল কেন?"

মেয়েটিও বলে : "আর ঐ গান—নামবি চল্, নামবি চল্? গাইতে গাইতে গেল—কি বলতে চাইল ওরা?"

এবারে পরী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। তার চোখে-মুখে নেমে আসে বিষাদের ছায়া। সে আস্তে আস্তে বলে : "ওরাই দুঃখ, ওরাই শোক; ওরাই ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা। পৃথিবীর যত কিছু নীচতা, ঘৃণা, হীনতার সঙ্গে ওদের ভাব। ওরা আজ পৃথিবীতে নেমে এল। গান গাইতে গাইতে ওরা তাই চলে গেল—বাসা বাঁধতে চলেছে সারা পৃথিবীতে। পৃথিবীর যেখানে, মানুষের মনের যে কোণে, যত কিছু কালো, যত কিছু অন্ধকার আছে, সেখানে ওরা বাসা বাঁধবে, আস্তানা গড়বে। আজ থেকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এই সব পোকাদের কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। সমস্ত আকাশ, বাতাস ভরে উঠবে মানুষের কান্নার শব্দে।"

প্যাণ্ডোরা আর ছেলেটির মুখ কাঁদো-কাঁদো হয়ে যায়। প্যাণ্ডোরা ভাবে, কেন সে খুলতে গেল বাক্সটা। ছেলেটি ভাবে, কেন সে জোর ক'রে বাধা দিল না প্যাণ্ডোরাকে? তারা দু'জনেই ভাবে, তারাই দায়ী সমস্ত পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট টেনে আনার জন্যে।

পরী ওদের মনের কথা বুঝতে পেরে বলে : "এতে দুঃখ করার কিছু নেই। যদিও বাক্সটা খোলার জন্যে তোমরাই দায়ী, তবু আমি জানতাম এ ঘটনা ঘটবেই। মার্কারির কথা শুনলে হয়ত এরকমটা হ'ত না, তবু......"

ওরা দু'জনেই এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করে : "তবু কী?"

"তবু অশান্তি নেমে আসত পৃথিবীতে। পৃথিবীর মানুষ কেবল যদি সুখই পায়, যদি কিছুমাত্র দুঃখের পরিচয় না পায়, তা হলে মানুষ দেবতাদের যে ভুলে যাবে!"

প্যাণ্ডোরা বিস্মিত হয়ে বলে : "কিন্তু মানুষ যদি এই রকম ব্যথাই পায়, কষ্ট দুঃখই পায়—তাহ'লে পৃথিবীতে সে বেঁচে থাকবে কী ক'রে ?"

পরী এবার আরও মিষ্টি ক'রে হাসল : "বেঁচে থাকবে আমার জন্যে। সেই জন্যেই তো আমি আছি।"

প্যাণ্ডোরার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবারে : "তুমি থাকবে ? থাকবে তুমি ? সত্যি কি মিষ্টি তোমার হাসি, কি সুন্দর তোমার রামধনু-রঙা ডানা !"

পরক্ষণেই সে আবার চিন্তিত হয়ে প্রশ্ন করে : "কিন্তু দুঃখের হাত থেকে, কষ্ট থেকে কী ক'রে রক্ষা করবে আমাদের ?"

—"আমি যে সবসময়েই তোমাদের কাছে-কাছে, পাশে-পাশে থাকব ! যখনই তোমরা দুঃখে কষ্টে ভেঙ্গে পড়বে, তখনই আমার দেখা পাবে তোমরা। আমার হাতের ছোঁয়ায় তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে। পৃথিবীতে আবার সুখ-স্বস্তি শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে নতুন ব্রতে দীক্ষা নেবে। হয়তো মাঝে মাঝে আমার দেখা পাবে না, মনে করবে আশা-পরী বোধহয় আর আসবে না। বোধহয় সে ভুলে গেছে। ঠিক সেই সময়েই আমার হাল্‌কা পাখায় ভর দিয়ে তোমাদের কাছে এসে, আমি তোমাদের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেব ! তোমরা ভুলে যাবে সব কিছু ব্যথা, সব কিছু শোক-কষ্ট-জ্বালা। তবে আমার উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে তোমাদের। বিশ্বাস না রাখলে আমাকে আর কোনদিনই পাবে না তোমরা।"

ওরা দু'জনেই একসঙ্গে বলে ওঠে : "নিশ্চয় বিশ্বাস রাখব, আশা-পরী তোমার উপরে।"

আশা-পরী ওদের দু'জনকে নিজের কাছে টেনে নিতে নিতে বলে : "তাহ'লে আমিও কোনদিন তোমাদের ছেড়ে যাব না।"

প্যাণ্ডোরা তার উজ্জ্বল চোখ দু'টি মেলে বলে : "কোনদিনও যাবে না ? চিরদিনই থাকবে ?"

ওদের দিকে সস্নেহ দৃষ্টি মেলে আশা-পরী উত্তর দিলে : "হ্যাঁ, চিরদিনই থাকবো।"

● কয়লা পুড়লে এত কমে যায় কেন ?

বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে—বস্তু অবিনশ্বর। তাই যদি হয় তবে একগাদা কয়লা পোড়ালে এতটুকু মাত্র তো ছাই পড়ে থাকে—এর অর্থ কি ?

সত্যি পদার্থ মাত্রই অবিনশ্বর। কয়লা পোড়ালে, এর কার্ব্বন নামক অংশ বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড্ নামক গ্যাসে পরিণত হ'য়ে চিম্‌নি দিয়ে বেরিয়ে যায়। কয়লার হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন অংশ কয়লার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে গ্যাস-আকারে বেরিয়ে যায়—বাকী যা পড়ে থাকে তা' শুধু অদাহ্য ছাই সাধারণতঃ কাদামাটির সমষ্টি।

খোকার চিঠি

—তারিণীচরণ বসু

ওগো দূরের মেঘ !
তোমার কাছে লিখ্‌ছি চিঠি একটু কমাও বেগ,
যখন তুমি তুলোর মতো আল্‌তো ভেসে যাও,
দুষ্টুমিতে মাঝে মাঝে সূর্য্য ঢেকে দাও ;
তোমার কাছে যেতে তখন মন যে আমার চায়—
তুমি তো আর থামো না, তাই স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়।

আবার যখন তোমার বুকে বিজ্‌লী কথা কয়,
কাজ্‌লা রঙে ছড়িয়ে পড়ো সারা আকাশময়,
তখন আমি মায়ের কোলে কাঁপি ঘরের কোণে,
গাছগুলো সব ঝাপ্‌সা ভাসে, জাগে যে ভয় মনে।

তুমি কেন নিঠুর এত, একটু দয়া নাই !
বোশেখ-রোদে, জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন তোমায় চাই—
তখন তুমি পালাও ছুটে, বৃষ্টি নাহি দাও !
তুমি ছাড়া আমরা যে হীন, বোঝো না কি তাও ?
ওগো দোসর মেঘ !
জানি তুমি থাম্‌বে না তো ; কমিয়ে তবু বেগ,
কাঁচা হাতের লেখা চিঠি একটু শুনে যাও—
সকল প্রাণে বাস্‌তে ভালো তোমার পরশ দাও।

দুষ্ট শিকারী

[বৌদ্ধ গল্প]

—শ্রীসুলতা কর

এক পাহাড়ী গ্রামে নবীন নামে এক শিকারী ছিল। তার মত ভাল শিকারী সে গ্রামে আর ছিল না, এমন কি তার আশপাশের চার-পাঁচটা গ্রামেও না। কিন্তু নবীন ভাল শিকারী হ'লে কি হবে তার মত নিষ্ঠুর আর দয়ামায়াহীন লোক সহজে দেখা যেত না। এজন্য গ্রামের লোকেরা যদিও তাকে ভাল শিকারী বলে প্রশংসা করত তবু তাকে পছন্দ করত না।

ছোট পাহাড়ী গ্রাম। সেখানে শিকার ক'রে আর কত টাকাই বা পাওয়া যায়, কাজেই ভাল শিকারী হয়েও নবীন ছিল খুব গরীব।

একদিন ভোরবেলা সে তীর-ধনুক আর শিকারী কুকুরের দল নিয়ে শিকার করতে বেরিয়েছে, এমন সময় দেখল গেরুয়া কাপড়-পরা এক বৌদ্ধ ভিক্ষু সেই গামে ভিক্ষা করতে আসছেন। দুষ্ট নবীন ভাবল—সন্ন্যাসীর মুখ দেখলেই আমার দিন খারাপ যায়, আর আজ এই সকালবেলা শিকারে বেরোবার মুখেই একে দেখলাম। শিকার যদি আজ না-ই পাই তবে একে জব্দ করব। এই সব ভাবতে ভাবতে সে শিকারী কুকুরের দল নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে গেল।

সেদিনটা তার খুব খারাপ কাটল। সারাদিনে একটি শিকারেরও খোঁজ পেল না। শিকারী কুকুরেরা ঝোপঝাড় ঘুরে মাটী শুঁকে শুঁকে একটি জন্তুরও সন্ধান করতে পারল না।

যখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তখন একজোড়া চমৎকার হরিণ দেখা গেল। শিকারী কুকুরেরা ত' পাগলের মত ছুটতে ছুটতে হরিণদের তাড়া করল। ভয়ে হরিণ দু'টি থমকে দাঁড়াল।

তাই দেখে নবীন মনের আনন্দে তাদের লক্ষ্য ক'রে তীর ছুঁড়ল। ভাবল—যাক বাঁচা গেল, এ হরিণ দু'টির চামড়া আর শিং বিক্রী ক'রে প্রচুর টাকা রোজগার হবে। সারাদিনের খাটুনি সাথক হ'ল।

কিন্তু তার ভাগ্য সেদিন সত্যিই বড় খারাপ। তীর হরিণের গায়ে না বিঁধে পাশের গাছে গিয়ে বিঁধল। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে হরিণেরা গভীর বনের ভেতর মিলিয়ে গেল।

এমন ব্যাপার কখনও হয় না। নবীনের হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ। রাগে দুঃখে

মনে মনে সে গজরাতে লাগল। ভাবতে লাগল—এসব যে হ'ল এ শুধু সেই সন্ন্যাসীর মুখ দেখার ফল। সারাদিন আমার আর কুকুরদের খাওয়া হ'ল না। হাতে একটাও পয়সা নেই। আজ রাতেও দেখছি উপোস ক'রে কাটাতে হবে।—কি আর করবে, কুকুরদের নিয়ে নবীন বাড়ী ফিরে চলল।

বন থেকে বেরিয়ে গ্রামে ঢোকবার পথে সে একটা বড় বটগাছের তলায় এসেছে, এমন সময় দেখল সকালের দেখা সেই গেরুয়া-পরা ভিক্ষু সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁকে দেখেই নবীন রাগে জ্বলে উঠল। চীৎকার ক'রে বলল—"সন্ন্যাসী ঠাকুর, আজ সকালে তোমার মুখ দেখে শিকারে বেরিয়েছিলাম। সারাদিন আমার আর কুকুরদের উপোস করতে হ'ল। রাতেও খাবার জুটবে না। দাঁড়াও তোমায় জব্দ করছি।" এই বলে সে শিস দিতে দিতে শিকারী কুকুরের দলকে ইশারা ক'রে সন্ন্যাসীকে তাড়া করবার জন্য লাগিয়ে দিল।

সারাদিন খেতে না পেয়ে কুকুরেরা এমনিতেই ক্ষেপে উঠেছিল, শিকারীর ইশারায় তারা পাগলের মত হয়ে সন্ন্যাসীর টুঁটি কামড়ে ধরবার জন্য ছুটে গেল। তখন সন্ন্যাসা নিজেকে বাঁচাবার কোন উপায় না দেখতে পেয়ে, তাড়াতাড়ি সামনের বটগাছে উঠে পড়লেন। কুকুরেরা আর তাঁর নাগাল পেল না। নীচে দাঁড়িয়ে তারা ভৌ ভৌ ক'রে বিকট চীৎকার করতে লাগল। নবীন কুকুরদের পাশে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ মজা দেখে হাসছিল। এখন ভিক্ষুকে তাড়াতাড়ি বটগাছের উপরের ডালে উঠে যেতে দেখে রেগে উঠে চীৎকার ক'রে বলল—"সন্ন্যাসী, ভাবছ খুব বুদ্ধি খাটিয়েছ, এবার আর তোমাকে আমি জব্দ করতে পারব না। আচ্ছা, এইবার দেখ কি ক'রে আমার হাত থেকে বাঁচতে পার।"

ভিক্ষু গাছের ডালে বসেছিলেন। তাঁর দু'টো পা নীচের দিকে ঝুলছিল। নবীন ধনুক উঁচু ক'রে ধরে তাঁর বাঁ পায়ের তলা লক্ষ্য ক'রে তীর ছুঁড়ল। তীর সোঁ সোঁ শব্দে গিয়ে ভিক্ষুর পায়ে বিঁধল। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে তিনি বললেন—"নবীন, আমি ত' তোমার কোন অনিষ্ট করিনি। কেন, তুমি আমাকে মারবার জন্য তীর ছুঁড়লে?"

হাঃ হাঃ ক'রে হাসতে হাসতে নিষ্ঠুর নবীন বলল—"সন্ন্যাসী আমি নিশ্চয়ই তোমাকে প্রাণে মারব। তোমার মুখ দেখার জন্যই আজ আমি খেতে পাইনি।"

এই বলে সে আবার ধনুকে তীর লাগিয়ে ভিক্ষুর ডান পায়ের তলা লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ল। তীর ডান পায়ের তলাতেও বিঁধল। ভিক্ষু যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে শরীরটা জোরে নাড়া দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গায়ের গৈরিক চাদরখানা খুলে গেল। সেই গৈরিক চাদরখানা হাওয়ায় উড়তে উড়তে ঠিক যেখানে নবীন দাঁড়িয়েছিল

সেইখানে এসে পড়ল ! আর সেই গৈরিক চাদরের তলায় নবীনের সমস্ত শরীরটা ঢাকা পড়ে গেল।

এখন শিকারী কুকুরেরা হঠাৎ দেখল গৈরিক কাপড়ে ঢাকা একটা মানুষ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বোকা কুকুরেরা ভাবল—এ নিশ্চয়ই ওই সন্ন্যাসী। ভৌ ভৌ শব্দে বিকট চীৎকার করতে করতে তারা গৈরিক চাদরে ঢাকা নবীনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক কামড়ে তার গলার নলি ছিঁড়ে ফেলল। তারপর টুকরো টুকরো করে তাকে ধারাল দাঁত দিয়ে কাটতে লাগল। নবীনের মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরোল না। কুকুরদের ধারাল দাঁতের কামড়ে এক মুহূর্তেই সে মারা গেল।

বুদ্ধদেব ধর্ম্মের উপদেশ দিচ্ছেন। [পৃঃ ২২৪

কুকুরেরা যখন নবীনের গেরুয়া ঢাকা শরীর লক্ষ্য ক'রে ছুটে আসছিল তখন ভিক্ষু গাছের ডালে বসে দেখছিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর মন নবীনের উপর দয়ায় ভরে উঠল।

তাড়াতাড়ি তিনি গাছ থেকে নামতে লাগলেন। ভাবলেন—আমাকে চিনতে পেরে কুকুরেরা যদি ওকে ছেড়ে দেয়, তাহলে প্রাণ দিয়েও আমি ওকে বাঁচাতে পারব।

কিন্তু তাঁর নামতে যেটুকু সময় লাগল তারই মধ্যে কুকুরেরা নবীনকে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলেছে।

ভিক্ষু যখন গাছ থেকে নেমে কুকুরদের সামনে দাঁড়ালেন তখন তারা নবীনকে নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ আর একজন মানুষের পায়ের শব্দ পেয়ে কুকুরেরা মুখ তুলে চাইল, আর ভিক্ষুকে দেখেই চিনতে পারল।

ব্যাপার দেখে কুকুরেরা থতমত খেয়ে গেল। বুঝতে পারল ভুল ক'রে তারা নিজেদের প্রভুকেই কেটে ফেলেছে। তখন প্রভুভক্ত শিকারী কুকুরেরা মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বনের ভিতর ছুটে পালাল।

ভিক্ষু গাছের তলায় দাঁড়িয়ে নবীনের টুকরো টুকরো করা শরীরটা দেখলেন। দুঃখে অনুশোচনায় তাঁর মন ভরে উঠল। ভাবলেন—হায় আমিই এই অভাগার মৃত্যুর জন্য দায়ী।

ওই সময় বুদ্ধদেব সেই শহরের বৌদ্ধবিহারে এসেছিলেন। ভিক্ষু ম্লান মুখে মাথা হেঁট ক'রে বিহারে ঢুকলেন। দেখলেন বেদীতে বসে বুদ্ধদেব শিষ্যদের ধর্ম্মের উপদেশ দিচ্ছেন। ভিক্ষু বেদীর পাশে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করলেন—"ভিক্ষু, তোমার মুখ এত ম্লান কেন ?"

তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন সন্ন্যাসী। তারপর বললেন—"প্রভু, আমিই তো এর মৃত্যুর জন্য দায়ী। আমার মন অনুশোচনায় ভরে উঠেছে। বলুন কি প্রায়শ্চিত্ত করব আমি ?"

শান্তসুরে বুদ্ধদেব বললেন—"তুমি মিথ্যা অনুশোচনা করছ। হিংসা আর ক্রোধের বশ হয়ে নবীন নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে। তুমি তো এজন্য দায়ী নও।"

তথাগত বলতে লাগলেন—"হে ভিক্ষুগণ, এই শিকারীর শোচনীয় মৃত্যু দেখে তোমরা এই শিক্ষা লাভ কর যে, 'হিংসা ও ক্রোধের বশ হ'লে মানুষের পরিণাম কত শোচনীয় হয়'।

সুতরাং তোমরা কখনও হিংসা ও ক্রোধের বশ হয়ো না !"

● মণিমুক্তা

রাত্রির গাঢ় কালিমার মধ্যে দেখি যেন কোন্ অজানা এক বিষাদের ছায়া। রাতের কালো ডানায় লক্ষ লক্ষ তারাদের ঝিলিমিলি—সে যেন আরও বেশী রহস্য-ঘেরা। যেন আরও বেশী স্বপ্নময়। রাতের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে তাই আমার এত বেশী ভাল লাগে। সুখের মধ্যে আনন্দ আছে, কিন্তু গভীরতা নেই —বিষাদের মধ্যেই আছে অন্তহীন গভীরতা। তাই রাত্রিকে আমার এত ভাল লাগে। রাত্রির গহন ছায়ার দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ে যায় মৃত্যুর কথা। মৃত্যুও ঠিক রাত্রির মতো কালো—তাই সে রাত্রির মতই রহস্যময়, রাত্রির মতো তার ভয়াল সৌন্দর্য্য এত আকর্ষণ করে। হে অন্তহীন মৃত্যু, তোমায় আমি স্বাগত জানাই !

—শেলী

ইংরেজী মাসের নাম

—শ্রীবিজনকুমার চৌধুরী

বাংলা মাসের সব নামই সংস্কৃত। জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিয়মানুসারেই বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, পূর্ব্বাষাঢ়া, শ্রবণা; পূর্ব্বভাদ্রপদ, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুষ্যা, মঘা, পূর্ব্বফাল্গুনী ও চিত্রা এই বারটি নক্ষত্রের নাম অনুসারে যথাক্রমে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন এবং চৈত্র মাসের নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু ইংরেজী মাসের নাম গ্রহ-নক্ষত্রের নাম অনুসারে হয়নি, হয়েছে রোমানদের দেওয়া দেবতা এবং সম্রাটের নামে। এই নামগুলি কেমন করে হলো আজ তাই বলব।

ইংরেজী প্রথম মাস জানুয়ারী নাম হয়েছে রোমানদের "জেনাস" নামক দেবতার নাম থেকে। এই দেবতার দুইটি মুখ। একটি সামনের দিকে ও আরেকটি পিছন দিকে। এই দেবতার বাঁ হাতে আছে একটি বড় চাবি। ইনি স্বর্গের দ্বাররক্ষক এবং আরম্ভ ও শেষের দেবতা। বৎসরে যেমন বার মাস তেমনি এই দেবতার মন্দিরেও বার জন দেবতা আছেন। এই দেবতার মন্দির যুদ্ধের সময় খোলা থাকত। রোমানরা কোন কিছু ভাল ভাবে আরম্ভ এবং শেষ করতে ইচ্ছা করলে জেনাসের পূজা করতেন। বৎসরের প্রথম মাসে মানুষ সাধারণতঃ গত বৎসর যা পেছনে পড়েছে এবং আগামী বৎসর যা সামনে রয়েছে তার কথা ভাবে। এইজন্যই রোমানরা দু'মুখো আরম্ভ এবং শেষের দেবতার নাম অনুসারে বৎসরের প্রথম মাসের নাম রেখেছিলেন।

দ্বিতীয় মাস ফেব্রুয়ারী আগে ছিল বৎসরের শেষ মাস। রোমানরা তাকে বৎসরের শেষ মাস থেকে দ্বিতীয় মাসে পরিবর্ত্তিত করেন খ্রীঃ পূ ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে। সেকালে রোমে "লুপারকাস্" দেবতার সম্মানের জন্য রোমানরা "ফেব্রুয়া" নামে একটি উৎসব করতেন এবং উৎসব শেষ হলে নিজেদের শুদ্ধ-চিত্ত মনে করতেন। কিন্তু এই উৎসবে যেমন গুরুতর খাওয়া-দাওয়া আর ফুর্ত্তি হতো তাতে শুদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল কি না কে জানে। যা হোক এই ফেব্রুয়া উৎসবের নামেই রোমানরা দ্বিতীয় মাসের নাম দেন।

তৃতীয় মাস মার্চ্চ থেকেই আগে বৎসর গণনা করা হতো। "মারস্" ছিলেন রোমানদের রণদেবতা। এই দেবতা ছিলেন ভীষণ শক্তিশালী এবং ভয়ঙ্কর যোদ্ধা। তাঁর একহাতে দীর্ঘ বর্শা আরেক হাতে উজ্জ্বল ঢাল এবং মাথায় বৃহৎ এক মুকুট, যার চারপাশ দিয়ে সব সময় খেলা করছে বিদ্যুৎ। এই ছিল রোমানদের কল্পনা। মারস্ ভীষণ বলশালী ছিলেন এ-কথা আগেই বলেছি। তাই রোমানরা সব কাজেই এঁর পূজা করতেন। রোমে এই সময়েই বেশী ঝড়-বৃষ্টি হয়ে থাকে বলে রোমানরা 'মারস্'-এর নামেই তৃতীয় মাসের নামকরণ করেন।

চতুর্থ মাস এপ্রিল। দারুণ শীতে সমস্ত জগৎ যেন অচেতন হয়ে পড়ে। শীতের শেষে মার্চ্চের ঝড়-বৃষ্টির পর বসন্তের রাণী "এপ্রিল" এসে আবার জগতে চেতনা সঞ্চার করেন। তার মধুর স্পর্শে সমস্ত প্রকৃতি যেন খুলে যায়। ডালে ডালে ফুল ফোটে, গাছে গাছে ডেকে ওঠে কোকিল। জন্ম নেয় নতুন গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা। প্রকৃতি যেন বন্ধন মুক্ত হন। এই দৃশ্য দেখে রোমানরা তাই এ মাসের নাম রাখেন এপ্রিল, অর্থাৎ উন্মোচনকারা।

পঞ্চম মাস মে "মাইয়া" নামে দেবীর নাম অনুসারে হয়েছে। রোমানদের বিশ্বাস, "অ্যাটলাস" নামে এক দেবতা সমস্ত পৃথিবীটাকে কাঁধে ক'রে আছেন। এঁর সাত কন্যার এক কন্যাই হচ্ছেন এই মাইয়া।

ষষ্ঠ মাস জুন সম্বন্ধে একটু গোলমাল আছে। অনেকের মতে জুনোদেবীর নামানুসারে এই মাসের নাম হয়েছে। আবার কারও মতে বিখ্যাত "জুনিয়াস্" বংশের নামানুসারে এই মাসের নাম হয়েছে। জুনো হচ্ছেন দেবরাজ জুপিটারের গর্ব্বিতা ও ঈর্ষাপরায়ণা পত্নী ও জুনিয়াস্ প্রাচীন রোমের একজন বিখ্যাত লোক। কিন্তু তিনিও গর্ব্বিত, অবিনয়ী। এই দু'জনের মধ্যে কার নাম অনুসারে যে এই মাস হয়েছে তা ঠিক করা কঠিন। তবুও মনে হয় জুনোর নামেই এই মাসের নাম হয়েছে কারণ রোমানদের অধিকাংশ মাসের নামই দেব-দেবীর নামানুসারেই হয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়েছে বলে মনে হয় না।

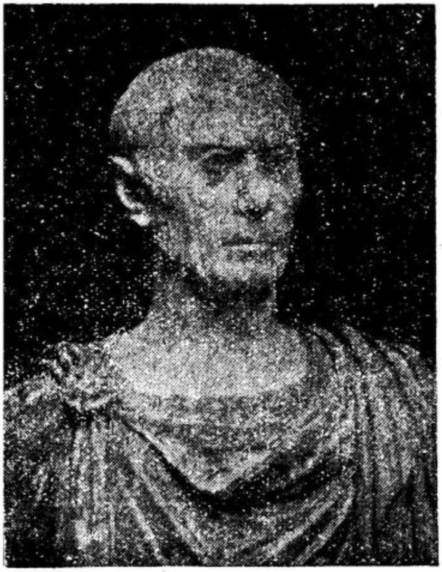

সম্রাট্ জুলিয়াস সীজার

সপ্তম মাসের নাম হয় রোমের বিখ্যাত সম্রাট্ জুলিয়াস সীজারের নামে। আগে যখন বছর আরম্ভ হতো তখন এই মাসের নাম ছিল "কুইনটিলস্" অর্থাৎ পঞ্চম মাস। কিন্তু, সীজার যখন দেশের পঞ্জিকায় নানারকম গলদ দেখে জানুয়ারী মাসকে প্রথম মাস করলেন, তখন এই মাসটা হয়ে গেল সপ্তম মাস এবং রোমানরা সীজারের সম্মানের জন্য এই মাসের নাম রাখল জুলাই।

জুলিয়াস সীজারের নামে যেমন সপ্তম মাসের নাম হয়েছিল তেমনি সীজারের প্রপৌত্র অগাষ্টাসের নামে অষ্টম মাসের নাম হয় আগষ্ট। যখন জানুয়ারী মাস থেকে বছর গোণা আরম্ভ হতো তখন বর্ত্তমান আগষ্ট মাসের নাম ছিল "সেক্‌সটিলিস্" বা ষষ্ঠ মাস। অগাষ্টাসের আসল নাম ছিল অক্‌টেভিয়স্। অগাষ্টাস্ প্রথমতঃ মার্ক এণ্টনী ও লেপিডাসের সাথে একযোগে রাজ্য চালাতেন। পরে তিনি নিজেই রোমের একক সম্রাট্ হন এবং রোমানদের শিক্ষায়, সভ্যতায় জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে তৈরী করেন। তাঁর সময় তিনি রোমের গৌরব এত বর্দ্ধিত করেন যে, রোমানেরা খুশী হয়ে তাঁর নাম দেন "অগাষ্টাস" বা মহান্ এবং তাঁর নামানুসারে অষ্টম মাসের নাম রাখেন আগষ্ট। এই আগষ্ট মাসেই অগাষ্টাসের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি ঘটেছিল। তখন আগষ্ট মাসে ছিল ৩০ দিন, জুলাইয়ে ছিল ৩১ দিন। আগষ্ট মাসে জুলাই মাস থেকে ১ দিন কম হওয়াতে পাছে অগাষ্টাস রাগ করেন, সেইজন্য রোমানরা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ১ দিন এনে আগষ্ট মাসের সাথে যোগ ক'রে দেন।

এরপর এল মজার ব্যাপার। পরের বাকী চারটি মাস সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর আর ডিসেম্বরের ভাগ্যে কিন্তু আর নতুন নাম জুটলো না। তাদের সেই আগের নামই রয়ে গেল। সেপ্টেম্বর শব্দের অর্থ হচ্ছে সপ্তম, অক্টোবরের অর্থ অষ্টম, নভেম্বরের অর্থ নবম আর ডিসেম্বর দশম।

এখন মজা হচ্ছে কি, আগের দিনে তো বছর আরম্ভ হ'তো মার্চ্চ মাস থেকে, আর শেষ হতো ফেব্রুয়ারীতে। সে অনুযায়ী হিসেব ক'রে দেখলে এই চারটি নামের অর্থ ঠিক ঠিক মিলে যায়। কিন্তু পরে সীজারের সময়ে যখন জানুয়ারী থেকে নতুন বছর গোণা হ'তে লাগলো তখন

এই মাস চারটির স্থান হোলো যথাক্রমে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ। কিন্তু স্থান পরিবর্ত্তন হ'লে কি হবে নামের কোনই পরিবর্ত্তন হ'ল না, সেই আগের নামই থেকে গেল। তার ফলে সপ্তম মাস হ'ল নবম, অষ্টম হ'ল দশম, নবম হ'ল একাদশ আর দশম হ'ল দ্বাদশ মাস। স্থান পিছিয়ে গেলেও নাম তাদের সেই আগের মতই থাকাতে একটা হাসির ব্যাপার হ'য়ে পড়েছে। মাস বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে এদের নামও বদলানো উচিত ছিল। কিন্তু মানুষের স্বভাবই এমনি যে তারা প্রাচীন প্রথা সহজে বদলাতে চায় না, তা যত অর্থহীন ও ক্ষতিকরই হোক না কেন।

রেলগাড়ী

—শ্রীপ্রভাকর মাঝি

রেলগাড়ী, রেলগাড়ী ঝিক্‌মিক্ যাও,
আদ্রা-আসানসোল-মধুপুর ধাও।
কত নদী বন মাঠ খন্দ খামার,
ভোঁস্ ভোঁস্ ধোঁয়া ছেড়ে হয়ে যাও পার।
চকচকে পথে, টরে-টক্কার থাম,
দেখতে দেখতে যাওয়া, ইস্ কী আরাম!
রেলগাড়ী, রেলগাড়ী চেনো কি আমায়?
প্রতিদিন চেয়ে থাকি খোলা জানালায়।
ভারি সাধ একবার রেলে চড়ে যাই—
দিল্লীর প্যাঁড়া কিনে পাটনায় খাই।
মা-মণি মিথ্যে আজ ধমকালো মোরে,
সেই থেকে মনটা যে ওঠে হুহু ক'রে।
আল্‌তো ছুঁয়েছি যেই টুটুলের গাল,
তাতেই হলেম, জানো, বেজায় নাকাল।
সক্কলে ষড় করে চুমো খায় তারে,
আমাকে এখন কেউ দেখতে না পারে।
ছোড়দির কাছে চলে যাব পাটনায়,
রেলগাড়ী, দয়া করে নেবে কি আমায়?

স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম সেনাপতি

১। আজ থেকে ১৭৫ বছর আগে আমেরিকা ছিল ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের অধীন। এই অধীনতা শৃঙ্খল থেকে দেশবা... যিনি মুক্ত করেছিলেন, তাঁর নাম জর্জ্জ ওয়াশিংটন। তিনিই স্বাধীন আমেরিকার প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হন।

২। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জন্ম হয়। মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতাকে হারা... ওয়াশিংটন ছিলেন মাতৃভক্ত। তাঁর মাতাও ছেলেকে সমস্ত মানবীয় গুণের দ্বারা মানুষ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন।

৩। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই তিনি জরিপের কাজে দক্ষতা প্রকাশ করেন। চাকরী নিয়ে সারা দেশটা জরিপ করতে গিয়ে না... নাতে কাজ করার ফলে নিজের দেশ সম্বন্ধে ভৌগোলিক জ্ঞানও তাঁর বৃদ্ধি পায় এবং ২০ বছর বয়সে তিনি দেশের রক্ষীদলে ভর্ত্তি হন।

১। ওহিও উপত্যকা নিয়ে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে ক্রমশঃই মনোমালিন্য বেধে ওঠে। ফরাসীরা ওহিওর খানিকটা ... দখল করে নিয়েছিল। তারই প্রতিবাদে ১০০০ মাইল দূরে ফরাসী সরকারের কাছে ইংরাজ সরকার ওয়াশিংটনকে পাঠান দূত হিসাবে।

২। কিন্তু ফরাসী সরকার বিনয়ের সঙ্গে ইংরাজের দূতকে ফিরিয়ে দেন, আর একথাও জানাতে ভোলেন না যে, ফরাসী সরকার ইংরাজের তাঁবেদার নয়। সুতরাং উত্তর আমেরিকার অধিকার নিয়ে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে জর্জ্জ ওয়াশিংটন বীরত্বের সঙ্গে ইংরাজপক্ষে যুদ্ধ করেন।

৩। মার্থা কার্টিস নামে এক বিধবাকে তিনি ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে বিবাহ করেন। বিবাহের পর তিনি চাষবাসে মন দেন। ... পদে পদে ব্রিটিশের বিধিনিষেধ তাঁকে বিরক্ত করে তোলে।

১। এই সময় ইংরাজেরা ক্রমশঃ আমেরিকানদের ওপর কর চাপাতে শুরু করে। কর ভারে জর্জ্জরিত হয়ে দেশের লোকের [illegible]দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সেই সময় জাতীয় কংগ্রেস তৈরী হলে ওয়াশিংটন তার কার্য্যকরী সমিতির সদস্য হন।

২। এইভাবে দশ বছর ধরে উৎপীড়িত হবার পর চাষী ও শ্রমিকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যুদ্ধের জন্য একটি সৈন্যদলও [illegible] হয়। কিন্তু অভাব দেখা যায় কেবল একজন নায়কের।

৩। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ জুলাই মাস। কংগ্রেস সর্ব্বসম্মতিক্রমে ওয়াশিংটনকেই তাঁদের সেনাপতির পদে বরণ করেন। সেনাপতি [illegible] ওয়াশিংটনের প্রথম কাজ হল তাঁর সৈন্যদলকে সুশিক্ষিত করে তোলা।

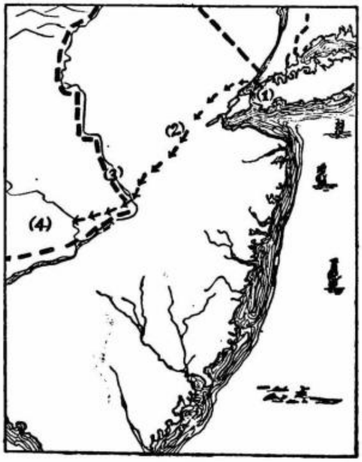

১। ওয়াশিংটনের সৈন্যদের না আছে পোষাক, না আছে খাদ্য। মাত্র শিকারী বন্দুক আর মনের সাহস সম্বল করে ওয়াশিংটন যুদ্ধে নামলেন। বোষ্টনে ইংরাজ দলকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ক'রে ওয়াশিংটন ছোটেন নিউইয়র্কের দিকে।

২। কিন্তু নিউইয়র্কের কাছে Delaware নদীর তীরে ওয়াশিংটনকে ইংরাজের কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রে নিতে হয়। [illegible] যুদ্ধে তাঁর প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য বীরত্বের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করে। এই পরাজয়ে সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। স্বাধীনতা-সূর্য্যও [illegible] হয়েই অস্তমিত হবার উপক্রম হয়।

৩। এত বিপদেও ওয়াশিংটন তাঁর মনোবল হারান না। দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি সুযোগের অপেক্ষা করেন। সুযোগ মিলেও [illegible] অপ্রত্যাশিতভাবে। রাতের অন্ধকারে ওয়াশিংটনের আক্রমণে ইংরেজদের ৩টি সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়।

১। আরো পুরো একটি বছর এই ভাবেই কেটে যায়। শীতে বস্ত্র নেই, পায়ে জুতা নেই—ঠাণ্ডায় চলতে গেলে পা জমাট হয়ে যায়। ওদিকে সৈন্যদের ছাউনিতে ছাউনিতে দেখা দিয়েছে খাদ্যাভাব। আর আশা নাই! কিন্তু ওয়াশিংটন অটল। এমনি সময় ফরাসীদের কাছ থেকে আসে সাহায্য।

২। আমেরিকার সমুদ্রে ভাসল ফরাসী যুদ্ধজাহাজ। ইংরেজ যুদ্ধজাহাজগুলোকে কূলের দিকে এগুতে ... ওদিকে ওয়াশিংটনের সেনাদলও মরণপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইংরেজদের ওপর। ইংরাজকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় ... আমেরিকানদের হাতে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা বাধ্য হয়ে জগতের সামনে আমেরিকার স্বাধীনতা মেনে নেয়।

৩। যুদ্ধশেষে ওয়াশিংটন তাঁর গ্রামের বাড়ী Mount Vernonএ ফিরে যান। কিন্তু দেশের লোক তাঁকে ... তাঁর গ্রামের বাড়ী থেকে তারা তাঁকে আবার সেই রাজধানীতে ফিরিয়ে এনে বসিয়ে দেয় তাদের রাষ্ট্রপতির আসনে। ১৭... ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে নিজের গ্রামের বাড়ীতেই মৃত্যু হয় জর্জ্জ ওয়াশিংটনের।

তেলিনীপাড়া (হুগলী) হ'তে শ্রীঅশোককুমার পাল তাঁর স্বর্গত দাদামহাশয় ৺হরিসাধন পাল মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে আমাদের সহযোগিতায় একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"হরিসাধন সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে এক সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়-বস্তু ঃ

মুখপত্র দ্রষ্টব্য

১। শুকতারার যে-কোন পাঠক-পাঠিকা প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারেন। ২। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে স্পষ্ট ক'রে লিখতে হবে। রচনা শুকতারার ৪ পৃষ্ঠার বেশী না হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৩। খাম বা মোড়কের উপর **"হরিসাধন সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"** এই কথাগুলো লিখতে হবে। ৪। জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত রচনা গৃহীত হবে। ৫। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা "শুকতারা" শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। ৬। শুকতারা কর্ত্তৃপক্ষের বিচার চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। রচনার গুণানুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় দু'টি পুরস্কার দেওয়া হবে।

প্রথম পুরস্কার ঃ—দেব সাহিত্য-কুটীরের প্রকাশিত ৬৲ টাকা দামের বই।

দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ—দেব সাহিত্য-কুটীরের প্রকাশিত ৪৲ টাকা দামের বই।

আরও মজার ঘটনা

—'যাদুসম্রাট' পি. সি. সরকার

অনেকদিন আগের কথা। আমি সেইবারেই প্রথম প্যারিসে গিয়াছি মাত্র। একদিন সেখানকার বিখ্যাত Champs-Elyse es (উচ্চারণ করা কঠিন "সাঁন্‌সে ডিঁসে") নামক জায়গায় বেড়াইতে গিয়াছি—একটু আগে ঐ বিখ্যাত সাঁন্‌সে ডিঁসের পার্শ্বে একটা বড় রেষ্টোরাঁতে খাইতে যাইয়া বহু পয়সা বাজে খরচ করিয়া আসিয়াছি। তাই মনটা ভারাক্রান্ত, কারণ একটা মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য আমার একার জন্য প্রায় ত্রিশহাজার ফরাসী ফ্রাঙ্ক (অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় পঁচিশ টাকার) মাছ মাংস ভাত খাইয়া ফেলিয়াছি—তাই বাগানে একা একা বসিয়া ডায়েরীর পাতায় হিসাব লিখিতে বসিলাম।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, ওদেশে বাগানে, পার্কে বহু চেয়ার এবং বেঞ্চি সারি সারি করিয়া সাজান থাকে, যেমন কলিকাতা ঢাকুরিয়া লেকের পাশেও পার্কে দুই চারিটি দেখা যায়। আমি দেখিলাম অসংখ্য চেয়ার ইতস্ততঃ খালি পড়িয়া রহিয়াছে—একটু আগে বৃষ্টি হইয়া মাটি স্যাঁৎসেঁতে হইয়া গিয়াছে—আমি পরিষ্কার টিনের চেয়ার পাইয়া উহাতে বসিয়া আপন মনে একা একা ডায়েরীর পাতায় নোট করিয়া চলিয়াছি—'হেন কালে হায়, যমদূত প্রায়' কোথা হতে এলেন একটি ফরাসী মহিলা। তিনি তৎক্ষণাৎ দশ পয়সার একটা টিকিট কাটিয়া আমার হাতে দিলেন অর্থাৎ চেয়ারে বসার জন্য ঐ দশপয়সা দক্ষিণা দিতে হইবে! আমি মন খারাপ করিয়া বাধ্য হইয়া পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিলাম এবং দশপয়সা দিতে গেলাম। ভদ্রমহিলা ততক্ষণে আরও একটি দশপয়সার টিকিট কাটিয়া বসিলেন। অপরাধ, আমি মনিব্যাগ বাহির করিবার সময় আমার হাতের ব্যাগটি অপর একটি চেয়ারে রাখিয়াছিলাম। যখন বলিলাম, স্যাঁৎসেঁতে জলে ভেজা মাটিতে ব্যাগটা না রাখিয়া ঐ চেয়ারে রাখিলে কাদা লাগিবে বলিয়া ওখানে এক মুহূর্ত্তের জন্য রাখিয়াছি, তখন তিনি বলিলেন, "তুমি অপর চেয়ারটা কাজেই দখল করিলে এবং সেইজন্যই আরও দশপয়সা।"

নগদ পাঁচ আনা আক্কেল সেলামী দিলাম। আর বুঝিলাম প্যারিসে গিয়া আমি একজন 'সত্যি বাঙ্গাল' বেশ বোকা বনিয়াছি। এখন প্যারিসে সহজে কোনও চেয়ারে বসিতে যাই না—ভয় হয়! প্যারিসে সবই এমন মজার। কফির দোকানে এক কাপ কফির দাম ৩০ ফ্রাঙ্ক। যদি সঙ্গে দুধ মেলান হয় তখন দাম ৩৫ ফ্রাঙ্ক, যদি

চেয়ারে বসিয়া খাইতে হয় দাম হইবে ৪৫ ফ্রাঙ্ক। কাজেই লোকেরা টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই তাহাদের চা এবং কফি পর্ব্ব শেষ করিতেছে—অধিকাংশ লোকই দুধ ছাড়া "কাল কফি" খাইয়া থাকে।

১৯৪৪ সালের শেষভাগে আমরা সিলেটে ম্যাজিক দেখাইতে যাই। আমার পার্টিতে একজন অষ্ট্রেলিয়ান সাহেব সহকারী ছিলেন। আমরা দুর্গাকুমার পাঠশালার প্রাঙ্গণে বিরাট প্যাণ্ডেল বাঁধিয়া 'শো' দেখাই। সিলেটে তখন একটা মস্তবড় পুল তৈয়ারী হইয়াছিল—খুব সুন্দর পরিচ্ছন্ন রাস্তা। কাজেই আমরা ঐ পুলের উপর দিয়া নদী বা খালের এপার ওপার সুন্দর রাস্তায় যাতায়াত করিতাম। পুলের উপর দিয়া গেলেই পয়সা দিতে হইত ⁄১০ বা ⁄০ আনা, ঠিক মনে নাই। একদিন আমার অষ্ট্রেলিয়ান সহকারী ঐ পুলের উপর দিয়া ওপারে বেড়াইতে যান এবং কয়েক মিনিট পরে ওপার হইতে এপারে আসিবার সময় পুলের প্রহরী কর্ত্তৃক এক আনা পয়সা দিতে অনুরুদ্ধ হন। পুলের প্রহরীর কথা শুনিয়া সাহেব বলিলেন—"তোমরা যে বল পুলের উপর দিয়া গেলে পয়সা লাগে, কৈ আমি যাইবার সময় কেহই ত' পয়সা চাহে নাই।" প্রহরী তখন বলিল—"সাহেব, তবে আপনি যাওয়া এবং আসার জন্য দুই আনা (⁄১০) দিন।" সেদিন অষ্ট্রেলিয়ান সাহেব খাঁটি বাংলাদেশে আসিয়া আমারই মত 'বাঙ্গাল' বনিয়া গিয়াছিলেন নিশ্চয়ই!

১৯৫০ সালে আমেরিকা যাত্রার পথে 'বসরা'-তে আমরা যে হোটেলে বসিয়া আছি—সেখানে একদল যাদুকর আসিয়া হাজির, "গিলি—গিলি—গিলি" বলিতে বলিতে তাহারা আমাদিগকে খেলা দেখাইতে লাগিল। মুহূর্ত্তে স্থানটি লোকে ভরিয়া গেল। বহু মার্কিন, আরবীয়, দুই-তিন জন চাইনিজ, ইন্দোনেশিয়ার প্রায় ১০।১২ জন ইত্যাদি নানা দেশের লোকে মিলিয়া খেলা দেখিতেছি। যাদুকর প্রথমে একটি টাকা চাহিয়া নিল। মার্কিন দর্শক একটি ডলার তাহার হাতে দিল। "গিলি—গিলি—গিলি" মুহূর্ত্তে উহা পাঁচটি ডলার হইয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে সবটাকাই উড়িয়া গেল। আমি খেলাটি আবার দেখিতে চাহিলাম। যাদুকর "গিলি—গিলি—গিলি" বলিয়া সেই ডলার নোটটা আমার হাতে দিল এবং আমাকে সঙ্গে সঙ্গে হাত মুঠা করিতে বলিল।

আমি নির্ব্বোধ দর্শকের মত সঙ্গে সঙ্গে হাত বন্ধ করিলাম। "গিলি—গিলি—গিলি" বলিয়া যাদুকর আমাকে হাত খুলিতে বলিল। আমার হাতে সেই ডলারটা থাকার কথা নতুবা পূর্ব্ববারের মত পাঁচ ডলার হওয়ার কথা। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমার হাতের মুঠা খুলিবামাত্র একটা বাজে কাগজ বাহির হইয়া পড়িল। কাগজটি খুলিয়া দেখি, উহা একটু আগে আমি যে বসরা হোটেলে প্রাতর্ভোজন করিয়াছি তাহারই বিল।

দর্শকগণ আনন্দে করতালি দিল। আমি বোকা বনিয়াছি বলিয়া সবাই আমাকে ঠাট্টা করিতে লাগিল। সবাই বলিল—“সে কি মশাই, ওর ডলার ফেরৎ দাও”—আমি বোকার মত চাহিয়া রহিলাম এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজের পকেট হইতে একটি ডলার তাহাকে দিয়া দিলাম। দর্শকরা আমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আবার হাসিতে লাগিল। খেলা শেষ হইল, আমরা এরোপ্লেনে উঠিব, এবার প্লেন মিশর দেশের রাজধানী কায়রো যাইয়া থামিবে। দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশই যাত্রী এবং আর সকলে স্থানীয় লোক। আমিও প্লেনে উঠিতে যাইতেছি—কিন্তু যাদুকর আমাকে কিছুতেই ছাড়িবে না—আরও চার ডলার তাহাকে দিতে হইবে।

আসল ব্যাপার অন্য কেহ জানে না—শুধু আমি আর ঐ ‘গিলি—গিলি’ যাদুকর বোঝে। দর্শকরা জানেন যে, আমার হাতের টাকাটি বাজে কাগজ হইয়া গেল এবং যাদুকর বুঝিয়াছে সে একজন শক্ত লোকের পাল্লায় পড়িয়াছে। সে আমার হাতে কৌশলে (হাত সাফাই করিয়া) একটির পরিবর্ত্তে পাঁচটি টাকা চালান দেয়। আর আমি এদিকে সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে চালান দিয়া ছেঁড়া কাগজ হাতে বোকা বনিয়া আছি। আমার এই পাঁচ ডলার হইতে এক ডলার তাহাকে দিয়াছি—কাজ এখনও চার ডলার বাকী।

উপায়ান্তর না দেখিয়া বেচারা যাদুকর পোর্টের কাষ্টম পুলিশ-অফিসারদের নিকট নালিশ করিল। কাষ্টম পুলিশ আমাকে ‘সার্চ্চ’ করিতে আসিলে দেখা গেল যে তাহার নিজের পকেটে নোটবুকের মধ্যে সেই চারি ডলার লুকান রহিয়াছে। তুমুল হাসির মধ্যে খেলা শেষ হইল।

জীবনে এই ধরণের যে কত রকম মজার ঘটনারই সম্মুখীন হইতে হয়—সে কথা মনে হইলে হাসি পায়।

● সুদূরের বাণী

অহমিকার গণ্ডীতে আবদ্ধ, অভিমানক্ষুব্ধ, দুঃখজড়িত লোকচক্ষুর আড়ালে আলোর শিশু সব ভুলে যেও না। অজ্ঞানে বা নির্জ্ঞানে যে কষ্ট পেয়েছ, তা ধুয়ে মুছে সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হও। তোমরা সকলের স্বস্তির ও আনন্দের প্রতীক—পুরুষসিংহ তোমরা। নিজ নিজ দৃঢ় চেতনাকে জাগিয়ে তোল। নিজের মনোবলের মহিমায় তোমরা প্রদীপ্ত হয়ে ওঠ। সংসারচক্রে অজ্ঞানতার ঘূর্ণিপাকে সকলে আবর্ত্তিত হচ্ছে—এ কোলাহল থেকে তাদের মুক্ত হতে সাহায্য কর। নিজের সর্ব্বস্ব পণ করেও তাদের এ উপকার তোমাকে সাধন করতেই হবে। তবেই দেশ আর জাতি তোমার গৌরবে হবে গৌরবান্বিত। —রবার্ট ব্রাউনিং

চাষী

—শ্রীনীলরতন দাশ

ভিক্ষার তরে একদা নগরে বুদ্ধ বাহির হন,
দেখেন অদূরে এক গৃহদ্বারে সমবেত বহুজন,—
তণ্ডুল ধান ভূস্বামী দান করিছে ভাণ্ড ভরি ;
প্রভু তার পাশে ভিক্ষার আশে দাঁড়ান পাত্র ধরি'।
ভিক্ষার্থীরে হেরি ঘৃণাভরে কহে সেই ভূস্বামী,—
"ভিক্ষুক যেই তারে নাহি দেই তণ্ডুলকণা আমি।
শস্যের মাঠে সারাদিন খাটে চাষবাস যারা করে,—
ভাণ্ডার-দ্বার মুক্ত আমার নিত্য তাদের তরে।
সন্ন্যাসী তুমি নাহি চষো ভূমি, শুধু পরান্নভোজী,—
অলস জীবন করিছ যাপন ধর্ম্মের নামে মজি'।"
শুনিয়া বচন তথাগত ক'ন,— "আমিও যে চাষী, ভাই।
ভণ্ডামি করি' ভাণ্ডটি ভরি' ভিখ নিতে আসি নাই।
শুন, ভূস্বামি, চাষ করি আমি এই দেহ-ভূমি মম,
পাপ রিপুগণ করি বর্জ্জন জমির আগাছা সম।
সংযম-বারি সিঞ্চন করি চিত্ত-ভূমিতে মোর,—
ক্ষেত্র ঊষর করি উর্ব্বর সারাটি জীবনভোর।
শস্য যেমন করে কর্ত্তন ভূমিকর্ষণকারী,
শ্রেষ্ঠ ফসল নির্ব্বাণ ফল লভি আমি দেহধারী।"
ভূস্বামী শুনি' বুদ্ধের বাণী ভাসে নয়নের জলে,
লভিয়া শিক্ষা লইল দীক্ষা নমি' তাঁর পদতলে!

———

—শ্রীমধুসূদন মজুমদার

পলাশীর যুদ্ধ

ভারত-ইতিহাসের কালচক্র ঘুরতে থাকে বাংলাকে কেন্দ্র ক'রে।

মৃত্যু-শয্যায় শায়ী নবাব আলীবর্দ্দী। সিরাজউদ্দৌলাকে ডেকে বলেন : সাদা চামড়ার বণিকদের বিশ্বাস কর না কোন দিন।

আলীবর্দ্দীর এই কথা স্মরণ রেখেছিলেন সিরাজ সারা জীবন। কিন্তু বাঙালী বোধহয় কোন গুরুত্ব দেয়নি তাঁর এ কথায়।

বিষবৃক্ষের মূলে জলসেচন করেছিল সে অমৃতফল লাভের আশায়!

দেশমাতাকে মুক্ত করতে ইংরেজকে প্রথম পদাঘাত করেছিল বাঙালী···দেশমাতাকে শৃঙ্খলিত করতেও তাকে স্বাগত জানাল বাঙ্গালীই।

রবার্ট ক্লাইভ···ইংরেজ নায়ক ক্লাইভ···চতুর ও সাহসী

লক্ষ্য তাঁর দিল্লী···অন্তর্দ্বন্দ্বে আত্মঘাতী দিল্লী।

কিন্তু তার আগে শক্ত করা দরকার নিজের পায়ের তলার মাটি—ধূর্ত্ত ক্লাইভ ভাবেন।

পশ্চিমে রয়েছে দুর্দ্ধর্ষ মারাঠা—দক্ষিণে রয়েছেন বীর হায়দার।

পূবে···কথাটা মনে উঠতে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন ইংরেজ নায়ক···অস্বাভাবিক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে তাঁর চোখ···সেখানে আসীন তরুণ যুবক নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

সিরাজের নিষেধ অমান্য ক'রে বাংলায় ইংরেজ গড়তে লাগল দুর্গ···করতে লাগল নিজেকে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত।

১নং চিত্র। চিন্তিত হন নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

২নং চিত্র। উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠেন ইংরেজ নায়ক ক্লাইভ…আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে তাঁর চোখ।

৩নং.চিত্র। বাংলার অস্তমিত সূর্য্যের রক্তিম আভার সঙ্গে মিশে গেল মোহনলাল আর মীরমদনের রক্তধারা।

ত্যক্ত অপমানিত নবাব—পদলেহী কুকুরের দুঃসাহসে! বাণিজ্য করার দয়ার ভিখারী হয়ে একদিন যে এসেছিল, সে আজ করছে আস্ফালন!

চলে সিরাজের বিজয়-অভিযান।

কলকাতা থেকে পলায়ন করে ইংরেজপুঙ্গবেরা—মুষ্টিমেয় যে কয়জন থাকে তারা স্বীকার করে নতি।

ক্রুদ্ধ ক্লাইভ। প্রতিশোধ নেবার জন্যে ক্ষেপে উঠেন তিনি। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মাথায় ভাসতে ভাসতে এসেছে ইংরেজ ধনরত্নের লোভে—পরাজিত হয়ে চলে যেতে নয়।

ছলে বলে কৌশলে সিরাজউদ্দৌলাকে নামাতে হবে মসনদ থেকে।

বিশ্বাসঘাতকের দল পুষ্ট করে ক্লাইভের পক্ষ। ঠিক হ'ল ইংরেজ-অনুগত সেনাপতি মীরজাফরকে বসান হবে মসনদে।

পলাশীর প্রাঙ্গণ। প্রভাত-সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশের রণবাদ্য উঠল বেজে।

দূরে শিবিরে বসে বিদ্রূপের চাপা হাসি হাসেন ক্লাইভ···এ তো যুদ্ধ নয়···যুদ্ধের অভিনয় মাত্র!

কিন্তু ভেঙে যায় ক্লাইভের সুখ-স্বপ্ন।

দূরে আকাশের বুক চিরে শোনা যায় হঠাৎ কামানের ভয়াবহ গর্জ্জন···গুড়ুম···গুড়ুম···গুড়ুম!

প্রাণহীন পুত্তলিকার মত দণ্ডায়মান সেনাপতি মীরজাফরকে সরিয়ে বীর মোহনলাল আর দেশপ্রেমিক মীরমদন এগিয়ে গেছেন যুদ্ধের সম্মুখ ভাগে—সিংহের মত লাফিয়ে পড়েছেন তাঁরা ইংরেজ সৈন্যের উপর।

ক্ষণিকের জন্যে পলাশীর নীরব প্রাঙ্গণ কম্পিত হয়ে ওঠে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত আক্রমণে!

কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা!

মীরজাফরের আদেশ ভিন্ন তাঁর সৈন্যরা করলে না যুদ্ধ।

বাংলার অস্তমিত স্বাধীনতা-সূর্য্যের রক্তিম আভার সঙ্গে মিশে গেল মোহনলাল আর মীরমদনের দেহের রক্তধারা।

[ক্রমশঃ

ব্যায়ামবীর

—সুনির্মল

—ভাই—

ওঠ্‌বোস্ করি আমি আকাশের তলে—
আমার ব্যায়াম দেখে অবাক্ সকলে।
স্বাধীন দেশের আমি নাগরিক ছোটো—
তাইতো আমার মুখে হাসি ফোটো-ফোটো।
ওরে দিদি দেখে যারে মোর কেরামতি—
ব্যায়ামবীরেরে দেখে খুশি হবি অতি।
এমন ব্যায়াম বল্ কে করিতে পারে ?
সকালে জুড়েছি খেলা মাঠের এ-ধারে।

আলোকচিত্র শিল্পী—শ্রীজয়ন্ত দাস, পুরী।

আলোকচিত্র শিল্পী—শ্রীমঞ্জুশ্রী দাস, পুরী।

—দিদি—

সাবাস্ ব্যায়ামবীর দেখি পুরোপুরি—
সত্যিই অবাক্ দেখে তোর বাহাদুরি।
মুখে কথা ফোটে নাই আধো-আধো বুলি
ব্যায়াম করিস মাঠে সব কাজ ভুলি।
মার কথা মনে নাই নাই কাঁদাকাটি—
ব্যায়াম করিস তুই অতি পরিপাটি।
সাবাস্ সাবাস্, সবে দেখে যাও না—গো
দেখে যাও দাদা-দিদি দেখে যাও মাগো।

খেলার আসর

—শ্রীসাংবাদিক

হকি লীগের আলোচনা—গত ১৭ই এপ্রিল ক্যালকাটা মাঠে প্রথম চ্যারিটি খেলা হয়ে গেল। খেলাটি হয় কলকাতার দুইটি নামকরা ক্লাব—মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের মধ্যে। খেলাটির জয়-পরাজয় মীমাংসা না হওয়ায় দুইটি ক্লাবকেই একটি ক'রে পয়েন্ট হারাতে হলো।

এবারের লীগ খেলায় যে ১৯টি দল প্রতিযোগিতা করছিল, তার মধ্যে এর আগেই ১৭টি দলকে পয়েন্ট হারাতে হয়েছে। বাকী ছিল কেবল ঐ দুইটি ক্লাব, তাদেরও পয়েন্ট হারাতে হলো। তবে মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল, মহঃ-স্পোর্টিং ও কাষ্টমস এখনও অপরাজিত আছে।

২৭শে এপ্রিল পর্য্যন্ত একটি করে পয়েন্ট হারিয়ে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব লীগ-টেবলের গোড়ার দিকে আছে। তারপরই মহঃ-স্পোর্টিং মাত্র দু'টি পয়েন্ট হারিয়ে তাদের তলায় স্থান পেয়েছে। আর কাষ্টমস হারিয়েছে মোট চারটি পয়েন্ট।

সেদিন মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের খেলা দেখবার জন্য মাঠে খুব কম লোক হয়নি। দর্শকরা সকলেই আশা করেছিলেন যে খেলাটি খুবই উচ্চস্তরের হবে। কিন্তু দর্শকদের একেবারে হতাশ হতে হয়েছে। লীগ খেলার সুরুর দিকে এই দু'টি দল যেমন গোলের ছড়াছড়ি করেছিল তা' দেখে লোকে মাঠে জড়ো হয়েছিল ভাল খেলা দেখবার আশায়। কিন্তু হকি খেলা যে এত নিম্নস্তরের হতে পারে তা' চোখে না দেখলে বোঝা যায় না।

আবার এই দুইটি দলের বেশীর ভাগ খেলোয়াড় নিয়ে বাংলার টীম গঠন করা হয়েছে রাজ্য-প্রতিযোগিতায় খেলবার জন্য। জানি না বাংলা দল এবার রাজ্য-প্রতিযোগিতায় কেমন খেলবে। বাংলাকে প্রথমে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে।

তবে এই খেলার আলোচনা করতে গেলে এটা বলতেই হবে যে ইষ্টবেঙ্গল দল মোহনবাগানের চেয়ে ভালই খেলেছে। তারা অন্ততঃ দুই একবার বিপক্ষদলের গোলের দিকে হানা দিয়েছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বল আর নেটের ভেতর ঢোকাতে পারেনি।

মোহনবাগান দলের কোন খেলোয়াড়ই ভাল খেলতে পারেননি। তাঁরা সব সময়ে গোল রক্ষা করতেই ব্যস্ত ছিলেন। খেলা দেখে মনে হয়েছিলো যে তাঁরা যেন খেলতে নেমেছিলেন কোন উপায়ে খেলাটি ড্র করবার জন্য।

শেষ পর্য্যন্ত গোলশূন্য ভাবেই খেলাটি শেষ হয়ে যায়।

বিশ্ব টেবিল টেনিস—এবারে স্টকহোমে বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা হয়ে গেল জাপান এবারেও প্রতিবারের মত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। দেখা গেছে ইউরোপের অনেক ধুরন্ধর খেলোয়াড়কেই জাপানী খেলোয়াড়দের কাছে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে।

পুরুষদের দলগত চ্যাম্পিয়নকে 'সোয়েদলিং কাপ' ও মেয়েদের দলগত চ্যাম্পিয়ানকে 'মার্সেল করবলিন কাপ' দেওয়া হয়। এবারে সোয়েদলিং কাপ প্রতিযোগিতায় ৩৩টি দেশ ও মার্সাল করবলিন কাপে ২৬টি দেশ যোগদান করেছিল। সোয়েদলিং কাপের খেলা হয় চারটি গ্রুপে। পরে গ্রুপ-বিজয়ীদের সঙ্গে নক-আউট প্রথায় খেলা হয়। মার্সাল করবলিন কাপের খেলা হয় তিনটি গ্রুপে, পরে গ্রুপ-বিজয়ীদের সঙ্গে লীগ প্রথায় খেলা হয়।

এবারে এই দু'টি কাপই জাপান লাভ করেছে। সোয়েদলিং কাপে ফাইনালে জাপান হাঙ্গেরীকে ৩—২ খেলায় পরাজিত করে। আর করবলিন কাপে জাপান চীন ও আগের বছরের চ্যাম্পিয়ন রুমানিয়াকে হারিয়ে দিয়ে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে।

ভারত এবারেও প্রতিবারের মত এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল। সোয়েদলিং কাপে প্রথম গ্রুপে আটটি দেশের সঙ্গে ভারতকে প্রতিযোগিতা করতে হয়। ভারত ছয়টি দেশকে পরাজিত করে ও দুইটি দেশের কাছে হেরে যায়। ভারত পরাজিত করে সুইজারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ভিয়েৎনাম, পর্তুগাল ও লুক্সেমবার্গকে আর পরাজয় স্বীকার করে চীন ও রুমানিয়ার কাছে। করবলিন কাপে এবারে ভারত যোগদান করেনি।

এবারে পুরুষদের সিঙ্গলস্ ফাইনালে জাপানের দুই বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় তোশিয়াকী তানাকা ও ইচিরো ওগিমুরাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যায়। তানাকা শেষ পর্য্যন্ত ২১—১১, ২১—১৮, ২১—১৯ গেমে ওগিমুরাকে পরাজিত ক'রে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন আখ্যা লাভ করেন। আর মেয়েদের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপ্ লাভ করেন জাপানের মিস ফুজি ইগুচি ২১—১৪, ২৪—২২, ১৯—২১, ২১—২৩, ২১—১৯ গেমে বৃটেনের এ্যান হেগেনকে পরাজিত্ ক'রে।

পুরুষদের ডাবলস্ ফাইনালে চেকোস্লোভাকিয়ার দুই খেলোয়াড় জাপানের বিশ্বজয়ী দুই খেলোয়াড়কে পরাজিত করে।

মেয়েদের ডাবলস্ ফাইনালে হাঙ্গেরী বৃটেনকে হারিয়ে দেয়।

মিক্সড্ ডাবলস্ ফাইনালে জাপানের দুই খেলোয়াড় চেকোস্লোভাকিয়া ও বৃটেনের খেলোয়াড়দ্বয়কে হারিয়ে দেয়।

ভারতের হ'য়ে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সুধীর থ্যাকার্সে, যতীন ব্যাস, কে নাগরাজ আর জুনিয়ার খেলোয়াড় দীপক ঘোষ ও জয়ন্ত ভোরা।

নূতন ধাঁধা

১। এক রাজকন্যা, তাঁর আগে পিছে চতুষ্পদ, মাঝখানে দৈত্য, কে তিনি ?

গৌতম ও সুচিত্রা—শ্রীরামপুর

২। প্রথমার্দ্ধ আপনজন, দ্বিতীয়ার্দ্ধও আপনজন, আবার সমস্তটাও আপনজন, কিন্তু এই [illegible] আপনজন আলাদা আলাদা লোক, কী ?

সমীর বসু—এলাহাবাদ

৩। পাওয়ার জন্য আকুলি বিকুলি করি, অথচ প্রাপ্তির ভয়ে আঁৎকে উঠি; কেমন [illegible] হয় ?

বিনয়কৃষ্ণ রায়—বাঁকুড়া

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। বিধিলিপি।   ২। কর্ণ।

৩।

প্রকার	কপাল
কারক	পাগ্‌লা
রকম	ললাট

এইরূপ দু-তিন রকম উত্তর হইবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম

কুমারী অঞ্জনা মিত্র ও বাসন্তিকা রাহা—আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভূপেন্দ্র, সৌমেন্দ্র, পার্থ, নীতিশ ও সুখেন্দু—[illegible], আসাম; অনন্তকুমার ভাদুড়ী—১১০৩১, পোঃ চান্‌পটিয়া; নীলু—নিউলাবস্তি; দেবু, শানু, রবি ও বাবলু—[illegible]; লক্ষ্মী, বুটলু, শঙ্কর, শক্তি, রত্না, জালু ও বাবলু—কিষাণগঞ্জ, পূর্ণিয়া; দেবব্রত, গোপাল ও শান্তনু—রাজেন্দ্র স্কুল, [illegible] শ্রেণী, সহরপুরা, ধানবাদ; তপন, সমীর, সলিল মজুমদার, বুবু ঘোষ, সতী ঘোষ ও টুটু ঘোষ, মা—টিনপ্লেট,

জামসেদপুর ; শ্যামাকান্ত দে, নিশীথ দত্ত, অরুণ ও মা—কনট্ সার্কাস, নিউদিল্লী ; সন্তোষ মুখার্জ্জী, বনবীর দত্ত, [illegible] শঙ্কর, অসীম ভট্টাচার্য্য, পতিতপাবন চৌধুরী, নূপুর পাল, দুলাল দাস, বাবু ও বিজয় দাস—হালিসহর ; মঞ্জু, [illegible] শঙ্কর—উমাদেবী মিশ্র বালিকা বিদ্যালয়, কাটিহার ; জহর, হর্ষিত ও রতন—১১১৫১ ; মানস বর্দ্ধন—১০৮৮৪, [illegible] কানন, পুতুল, গাবু, বাবলু, বাসু ও মন্টু—১৬৭৩৪, গাংগুটীয়া ; দুলু, বুলু, মোহন, জহর, কালু ও সুকুমারবাবু—[illegible] তিলায়া ; উষারঞ্জন, মণিকুন্তলা, সুধাংশু, অনুতা ও উর্দ্ধেন্দু দাস—ডিব্রুগড় ; জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়—[illegible] কোরবা কলিয়ারী, বিলাসপুর ; বিমলেন্দু দাসচৌধুরী—বিবেকানন্দ বিদ্যালয়, ডিগ্‌বয় ; বাদল মিত্র—১৪৮৯৮, [illegible] কাছাড় ; সমীর, বাচ্চু, বুড়ো, বিজন, বারীন, দুর্গারাণী, নিমু, লালু, গৌরাঙ্গ ও সান্টু—এগ্রিকো, জামসেদপুর ; পরেশ ব্যানার্জ্জী, রবীন্দ্র ব্যানার্জ্জী, আলপনা ব্যানার্জ্জী, টুলু ব্যানার্জ্জী, অসিত দাশ, শ্রীলেখা, মীরু চট্টোরাজ, [illegible] মুখার্জ্জী ও অসীম চ্যাটার্জ্জী—এগ্রিকো, জামসেদপুর ; শ্যামাপ্রসাদ—১৪১০৮, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ ; [illegible] কুমার, প্রদীপ, মৃদুল, টুকু, বাচ্চু, প্রণিতা, বিনীতা, সবিতা চন্দ, জামাইবাবু, জেঠিমা, জেঠামশাই, সমীর, খুকু, [illegible] নীতু, মিনু ও ছোটন—আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ; দেবকুমার গাঙ্গুলী—আরামবাগ, হুগলী ; নারায়ণ [illegible] চট্টোপাধ্যায়—গাবতলা লেন, বেহালা ; তপতী সেন রায়—১৫০৮৫, ঝিকপানি, সিংভূম ; সন্তোষ, অতুল, [illegible] প্রবীর—আলীপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ; কস্তুরী ও মিনু মুখোপাধ্যায়—ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা ; [illegible] রায়—পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা-২৯ ; রেখা, দীপক, রত্না, গৌরী, শঙ্কর ও মাধব—মতিলাল কলোনী, [illegible] শ্রীমতী দে, পুষ্প দত্ত, মীরা দে ও শ্রীজিত দা—কুমারগ্রামদুয়ার, জলপাইগুড়ি ; বাসু, দীপক, নন্তু, ঝন্টু ও নীলা [illegible] কদমা, জামসেদপুর ; সাথী দাশগুপ্তা—১১৮৮২, বিরামভবন, রংপুর ; প্রভাবতী, আরতী, ভারতী ও কেয়া [illegible] মেখলিগঞ্জ, কুচবিহার ; দীপঙ্কর দাশগুপ্ত—১৬৮৫০, নাগপুর ; হীরক, চম্পক, কৃষ্ণা ও বিজয়া—আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ; ভাস্কর সেনগুপ্ত—ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ; মঞ্জু চক্রবর্ত্তী ও আমি—নাকতলা, কলিকাতা ; বেণু, [illegible] মিনু, ছানা ও চন্দন—১৩৪৮৪, বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ ; বৈদ্যনাথ, বচন, তুষার, খোকন ও কমল—নাকতলা, কলিকাতা ; সত্য ও সমীর কুণ্ডু—বর্দ্ধমান ; শক্তিজিৎ ভড়—চন্দননগর ; নমি, মঞ্জু, মিনতি ও মাধব—বেলেঘাটা, কলিকাতা ; বীণা, মহু, মান্তা, বনু ও তমু—চ্যাটার্জ্জীপাড়া লেন, বৈদ্যবাটী ; অশোককুমার চৌধুরী, মনীন্দ্রমোহন দে ও মনীন্দ্র [illegible] গোঁসাই লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ; ওয়াদুদ, রেণু, আজব, আকবর, মাতাই ও সামসুল—বামুনআড়া, বর্দ্ধমান ; খোকন ও মনু—কালিপাহাড়ী, বর্দ্ধমান ; ভাস্কর ও চাঁদ রায়—১৩৫২৯ ; নির্ঝরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—[illegible] মল্লাই, হুগলী ; বাচ্চু ও তুলতুল—১৩৩৮৪, মোহনবাড়ী, মেদিনীপুর ; গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১৪৯১১ ; [illegible] বাসন্তী, ঝর্ণা ও ছায়া—হালিসহর ; নিরাপদ চট্টরাজ—মিঠাপুকুর, বর্দ্ধমান ; অনিন্দ্যকুমার মিত্র—১৭০১৪, চানপটি [illegible] খোকন ও গুঞ্জন—ডোমচাঁচ, হাজারিবাগ ; অনিল, বোঁচু, নালটু, দিনু ও পচা—সিন্ত্রি ; রথীন, দীপেন [illegible] সোমেন, শিবাজী ও উমা দে—টিনপ্লেট্, জামসেদপুর ; রবীন্দ্রনাথ সরকার ও নীলাব্জ সেন—কদমা, জামসেদপুর ; বিজয় ও প্রশান্ত—কাটীহার ; দিলীপ ও রথীন্দ্র বসু—১০৮৭৮ ; আরতি, মিনতি, দীপ্তি ও গণেশ—রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান ; হীরক, ছন্দা, বাবলু, ডুডু, গুড্ডুল, পিয়া, টুকটুক ও লছমিবাঈ—রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান ; বিধানচন্দ্র রায়—রেলওয়ে [illegible] গৌহাটী ; মহুয়া চট্টোপাধ্যায়—মুঙ্গের ; সমর, মিনু, নূপুর ও মিঠু—কলিকাতা ; মতিলাল মুখোপাধ্যায়—[illegible] হুগলী ; হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১৩১৪৯ ; কুমার ভূধর মণ্ডল—১৫০৯৪ ; দীপককুমার দাশ—১০৮৮৬ ; [illegible] স্বপন, নির্ম্মল, শোভন, গণেশ, সঞ্জীব, বেবি ও মা—তার কোম্পানী, জামসেদপুর ; মদনমোহন মণ্ডল—ত্রিশালন ; [illegible] কুমার ও লতিকা চট্টোপাধ্যায়—রংপুর, বর্দ্ধমান ; পরেশ দাশ—১৩৫৬৫ ; দিলীপ, অশোক, প্রফুল্ল, ডন্টু, হীরু, [illegible] ও পন্টু—কামরূপ ; দীনেন্দ্র, নৃপেন্দ্র, নরেশ, নির্ম্মল, সন্ধ্যা, ইন্দ্রাণী, দীপু, তপন, ছবি, রথীন, আলো, দীপক, [illegible] সলিল, শিশির, বিভা, হাসি, গৌরাঙ্গ, ডেপু ও বুটন—এগ্রিকো, জামসেদপুর ; অনু, রুনু, দেবী, বিধু, গাহু ও শিখা—হাজরা লেন, কলিকাতা ; ডরেচ্ মেণ্ডিজ্—ডিগবয়, আসাম ; ইন্দিরা, কাঞ্চন ও তুহিন সরকার—ডাঃ নিকলস্ [illegible] আসানসোল ; শ্রীসত্যনারায়ণ হালদার—১২৯৮৩, কাসুন্দীপাড়া।

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

বন্দে মাতরম্।

শুভ বৈশাখে তোমরা সকলে আমার অন্তরের প্রীতি গ্রহণ কর।

কালবৈশাখীর ঝড় আকাশে আসবার আগে, ঝড় বয়ে গেল সারা দেশের মনের ওপর দিয়ে, দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচনের ঝড়। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে এই সাধারণ নির্ব্বাচনই হলো জাতির সব চেয়ে বড় দায়িত্ব আর কর্ত্তব্য। এই নির্ব্বাচনের ভেতর দিয়ে আমরা নিজেরাই আমাদের দেশের ভাগ্যকে গড়ে তুলি, যাঁরা আমাদের শাসক এই নির্ব্বাচনের ভেতর দিয়েই তাঁদের আমরা শাসন করি। নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমরা যত সচেতন হবো, ততই বাড়বে আমাদের জাতীয় জীবনের সজাগ্রতা।

দ্বিতীয় নির্ব্বাচনের ভোট-গণনা শেষ হয়ে গিয়েছে, ফলাফলও সব জানা হয়ে গিয়েছে। এবার ভোট দেওয়ার ব্যাপার থেকে স্পষ্ট দেখা গেল, আমাদের দেশের জনসাধারণ, যতই অশিক্ষিত হোক্ না কেন, রাজনীতি সম্বন্ধে রীতিমত সচেতন এবং তারা রীতিমত চোখ চেয়ে দেখে ভোট দিতে সক্ষম। গতবারের নির্ব্বাচনের চেয়ে এবার ভোট দেওয়ার উৎসাহ ও প্রেরণা খুব বেশী দেখা যায়, বিশেষ ক'রে নারী-ভোটারদের মধ্যে। দূর পল্লীগ্রামে নিদারুণ রোদকে অগ্রাহ্য ক'রে দলে দলে সাধারণ ঘরের মেয়েরা দীর্ঘ পথ বেয়ে এসেছেন ভোট দিতে।

ভোটের ফলাফল তোমরা সকলে নিশ্চয়ই জানো। এবারকার ফলাফলের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ভারতের দক্ষিণতম অঞ্চলে কেরালা প্রদেশে কম্যুনিষ্ট পার্টির জয়লাভ এবং নির্ব্বাচনে সব চেয়ে বেশী সংখ্যক আসন দখল করার অধিকারে তারাই কেরালাতে শাসন-ভার গ্রহণ করছেন। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ আজ তাই কেরালার দিকে চেয়ে আছে। প্রসঙ্গত একথা বোধহয় তোমরা জান, ভারতের মধ্যে কেরালাতেই শিক্ষিত লোকের হার সব চেয়ে বেশী।

বৈশাখ বাঙালীর বড় প্রিয় ঋতু। বাঙালী যেদিন তার গ্রামেই বসবাস করতো, সেই বৈশাখের খর-রৌদ্র-দাহে সে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতো, কখন গ্রামান্তের বন-বন কাঁপিয়ে, ধুলোর ধ্বজা উড়িয়ে আসবে কাল-বৈশাখী······ঘন কালো মেঘে মেঘে ভরে যাবে আকাশ, রৌদ্র-দগ্ধ দিগন্ত থেকে ধেয়ে আসবে বৃষ্টি-ভরা ঝড়ো হাওয়া, তপ্ত মাটীর বুকে পড়বে বৎসরের প্রথম বর্ষণ, মাটী থেকে উঠবে অপূর্ব্ব এক

সোঁদা ভিজে গন্ধ……ঘরের পাশে বাগানে ঝড়ের আঘাতে পড়বে টুপ্ টাপ্ সব কাঁচা আম……সেই আম কুড়োবার জন্যে ছুটবে ছেলেমেয়ে বুড়োর দল……

শহরে বসে দেখা যায় না ঋতুর রূপ। শহরবাসী ছেলেমেয়েরা জানে না বৈশাখের সে-রূপের পরিচয়।

শহরবাসী বাঙালী ছেলেমেয়ের কাছে বৈশাখ কিন্তু অন্য এক কারণে আজ প্রিয় হয়ে উঠেছে।

বাংলা দেশে বৈশাখের সঙ্গে একটী মানুষের স্মৃতি অনন্তকালের মত গাঁথা হয়ে গিয়েছে, সে-মানুষ হলেন রবীন্দ্রনাথ।

২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। তাই কি প্রতি-বৈশাখে কবিকে বাঙালীরা এমন ক'রে স্মরণ করে?

প্রত্যেক মহাপুরুষই তো কোন-না-কোন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। সে-মাস এলে তেমনি ক'রে কি সেই মহাপুরুষের কথা আমরা স্মরণ করি?

প্রত্যেক মহাপুরুষেরই জন্মদিন পালন করা হয়। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালীর ক্যালেণ্ডারে ২৫শে বৈশাখ আলাদা লাল কালিতে ছাপা থাকে।

কেন?

তার কারণ, আর কোন মহাপুরুষই তাঁর জন্মদিনকে নিজে এমন অপরূপ ক'রে দেখে আর দেখিয়ে যান নি, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে নানা কবিতায়, নানা রচনায়, নানা প্রার্থনায় তাঁর জন্মের এই প্রথমদিনকে দেখিয়ে গিয়েছেন।

আগে, ভাগ্যবানের গৃহে পুত্র-সন্তানের জন্ম হলে, আনন্দ-শঙ্খ-রোলে তা ঘোষণা করা হতো…তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর অপরূপ কবিতায় আর গানে নব-আবির্ভাবের যে শঙ্খ-রোল ধ্বনিত ক'রে গিয়েছেন, শূন্যে শূন্যে সে-ধ্বনি আজও জেগে রয়েছে, যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে ততদিন বাঙালী সে-শঙ্খধ্বনি শুনতে পাবে। সে-ধ্বনি দ্বারে দ্বারে এসে ডাক দিয়ে যায়, "দ্বারে আসি দিল ডাক, পঁচিশে বৈশাখ!"

এই যে পঁচিশে বৈশাখের ডাক, এ কিসের ডাক? ঐদিনে ঊনবিংশশতাব্দীর কোন এক বৎসরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ নামে এক শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল, এ কি শুধু তার জন্মদিনের ডাক?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্মদিনকে কবিতায় অমর ক'রে গিয়েছেন, তাঁর জন্মদিন বলে নয়, যে-কোন মানুষের জন্মদিন বলে, যে-কোন নব-সৃজনের জন্মদিন বলে, যে-কোন নবীন বিস্ময়ের জন্মদিন বলে। তাঁর জন্মদিনের আনন্দ আর বিস্ময়ের ভেতর দিয়ে তিনি দেখেছেন নব-আবির্ভাবের আনন্দ আর বিস্ময়কে।

প্রভাতে প্রতিদিন আকাশে সূর্য্য ওঠে, প্রতিদিন হয় রবির নব-জন্ম। ···গৌরবতায় কুঁড়ির ভেতর থেকে জন্ম নেয় ফুল, ঝরা ফুলের বীজ থেকে জন্ম ·নয় ফল। নিঃশব্দে কোথায় মাটীর ওপরকার আবরণ একটু সরিয়ে জন্ম নিয়েছে ··ত ছোট একটা গাছের অঙ্কুর, সেই অঙ্কুরটুকু জন্মাবে বলে স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, মাটীর ·লায় কি মহানিঃশব্দে চলেছে বিরাট আয়োজন, তৃণে লতায় ফলে ফুলে অরণ্যে, ··স্বরে প্রতি মুহূর্ত্তে উঠছে অসংখ্য আনন্দ-ধ্বনি, আমি এসেছি, আমি আছি !

অস্তিত্বের এই আনন্দ আর বিস্ময়, রবীন্দ্রনাথ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন তাঁর ·ন্মদিনকে উপলক্ষ ক'রে আমাদের সকলের মনে।

প্রতিদিন প্রভাতে আকাশে নতুন রবির জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যেমন আমরা ·তিদিন নতুন ক'রে জন্মাই, তেমনি প্রত্যেক পঁচিশে বৈশাখে কবির জন্ম-তিথি পালন ·রার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অজ্ঞাতে আমরা নিজেদেরও জন্মতিথি পালন করি, নৃত্যে ·নে ছন্দে সুরে সেদিন বাঙালীর মন নব-আনন্দে নতুন ক'রে জন্মায়।

তাঁর জন্মদিনে কবি এই নব-আনন্দে নতুন ক'রে জন্মাবার আশীর্ব্বাদ আমাদের ·ন্যে রেখে গিয়েছেন।

প্রার্থনা করি, বাঙালী যেন নিত্য-নবের সে-আনন্দ না ভোলে। কাল-বৈশাখীর ·ালো মেঘ থেকে যেন সে পারে বিদ্যুৎ নিয়ে খেলতে। জয় হিন্দ্—

—দাদুমণি।

ছোটদের বন্ধু

দীর্ঘ ঊনআশী বছর বয়সে, বাংলার রূপকথার অমর কথক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র ·জুমদার গত ১৬ই চৈত্র রূপকথার রাজ্যেই মহাপ্রয়াণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের একটা ·শেষ দিকে তিনি সকলের ওপর মাথা ছাড়িয়ে বৃহৎ বটের মতন দাঁড়িয়ে ছিলেন। ·াগজে কাগজে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পরিবেশন করবার সময় তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয়েছে, ·তনি শিশু-সাহিত্যের একজন অদ্বিতীয় লেখক ছিলেন। সেটা তাঁর সঠিক পরিচয় ·য়। তাঁর সঠিক পরিচয় হলো, বাংলার রূপকথার সাহিত্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, ·য রূপকথা শুধু শিশুরাই শোনে না, শুধু কিশোর কিশোরীরা শোনে না, যে-রূপকথা ·শোনে এবং শুনে আনন্দ পায় ছেলে, বুড়ো, যুবা, যুবতী সকলে। প্রত্যেক মানুষের ·নে বয়স লুকিয়ে এক চিরশিশু বাস করে, প্রকৃত রূপকথা হলো সেই চিরশিশুর ·ন্যে। দক্ষিণারঞ্জনের মুগ্ধ পাঠক হলো সেই চিরশিশু।

প্রত্যেক প্রাচীন জাতির জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে নানা বিচিত্র ধরণের রূপকথা ·াছে। এই সব রূপকথা মুখে মুখে এক যুগ থেকে আর এক যুগে আসে। এবং

মুখে মুখে চলাফেরা করার দরুণ অনেক সময় অনেক রূপকথা হারিয়ে যায়, বিকৃত হয়ে যায়। বাংলাদেশেও বহু প্রাচীনকাল থেকে এই রকম বহু রূপকথা বৃদ্ধ আর বৃদ্ধাদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতো। অনেকের হয়ত মনে আছে, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে প্রতিদিন বিকেল বেলায় একজন এই সব রূপকথার গল্প বলতেন। তাঁর মুখে এই সব রূপকথা শোনবার জন্যে দূর-দূরান্তর থেকে লোক আসতো এবং ছেলে বুড়ো সবাই মিলে তাঁকে ঘিরে মন্ত্রমুগ্ধের মতন সেই সব রূপকথা শুনতেন।

মুখে-মুখে-ছড়ানো সেই সব রূপকথাকে দক্ষিণারঞ্জন ঠাকুরমার ঝুলি আর ঠাকুরদার ঝুলিতে ছাপার অক্ষরে চিরকালের মতন বাঁচিয়ে রেখে গিয়েছেন। তাঁর চরম কৃতিত্ব হলো, রূপকথা বলার একটা আলাদা ঢঙ আছে, আলাদা একটা ছন্দ, সুর, যতি আছে। দক্ষিণারঞ্জন রূপকথা বলার সেই স্বতন্ত্র ছন্দ, সুর আর যতিকে অপরূপ এক নতুন ভঙ্গীতে সাহিত্যে রূপ দিয়ে গিয়েছেন। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে তিনি সম্পূর্ণ একটা নতুন ছন্দ আর সুর সৃষ্টি করে গিয়েছেন এবং সেখানে সেই জাতীয় রচনায় তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই।

এই জাতীয় সাহিত্যিকদেরই প্রাপ্য, জাতির সম্মান, রাষ্ট্রের সম্মান। আজ তাঁর প্রয়াণ-সমাচার নিবেদন করতে গিয়ে এই কথাই মনে হচ্ছে, রবীন্দ্র-পুরস্কার পাবার দাবী রাখে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি। ভারতের আর কোন ভাষায় এই জাতীয় অপরূপ গদ্য আছে কি না, জানি না।

নয়া পয়সা

গত ১লা এপ্রিল থেকে ভারতে দশমিক মুদ্রা চালু হয়েছে। এর ফলে একটাকায় ৬৪ পয়সার বদলে ১০০ নয়া পয়সা পাওয়া যাবে। সম্প্রতি চার রকমের মুদ্রা চালু হয়েছে। সরকার পুরাণো মুদ্রা তিন বছর চালু রাখবেন বলেছেন। গোল বাধছে, এই পুরাণো পয়সার দাম নিয়ে। হিসাব করতেও লোকের বেশ অসুবিধা হচ্ছে। অধিকাংশ লোকই নয়া পয়সার একটা চার্ট হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতদিনের পাঠশালায় শেখা শুভঙ্করার অঙ্ক লোককে ভুলতে হচ্ছে। নয়া পয়সা ভালভাবে চালু হলে, তখন আর এ গোলমাল থাকবে বলে আমাদের মনে হয় না।

অন্ধদিগের সংবাদপত্র

লুই ব্রেইল অন্ধদের লেখার জন্য যে পদ্ধতি আবিষ্কার করে যান, তা ব্রেইল পদ্ধতি নামে বিখ্যাত। সারা জগতের দৃষ্টিহীনেরা এই পদ্ধতিতেই লেখা পড়া শেখেন।

সম্প্রতি দৃষ্টিহীনদের জন্য বিলাতে যে সংবাদপত্রটি প্রচলিত আছে, তার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছে। পত্রিকাটির নাম, "ন্যাশনাল ব্রেইল মেল"। এই পত্রিকাটি "ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট্ ফর দি ব্লাইণ্ড" থেকে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি যাঁরা কম্পোজ করেন তাঁরাও দৃষ্টিহীন। প্রত্যেক দৈনিক পত্র থেকে সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি আস্তে আস্তে তাঁদের কাছে পড়া হয় এবং তাঁরা সেই প্রবন্ধটিকে ব্রেইল পদ্ধতিতে কম্পোজ করেন। দৈনিক চৌদ্দশ' কপি ছাপা হয়। প্রায় পাঁচ হাজার পাঠক এই পত্রিকাটি দৈনিক পড়ে থাকেন। বর্ত্তমানে পত্রিকাটির দাম মাত্র তিন পেন্স। এই পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যার খরচ পড়ে এর পাঁচ গুণেরও বেশি।

হাঁচি-টিকটিকির ফল

'হাঁচি-টিকটিকির বাধা, যে না মানে সে গাধা'—কথাটা কেবল প্রবাদ বাক্যই নয়—সম্প্রতি প্রমাণও হয়ে গেছে।

আমেরিকার কোন এক ষ্টেশন থেকে ট্রেণ ছাড়বার সময় হঠাৎ তার চালক জোরে হেঁচে ওঠে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেণটি থেমে যায়। এবং প্রায় কুড়ি মিনিট পরে ট্রেণটি চলতে থাকে। অনুসন্ধানে জানা যায়, ঐ ড্রাইভারের বাঁধানো দাঁত মুখ থেকে বেরিয়ে ছিট্‌কে বাইরের লাইনে পড়ে। গাড়ি থামিয়ে সে নাকি তারই খোঁজে গিয়েছিল।

মঙ্গলগ্রহের নতুন খবর

কয়েক বছর ধরে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা মঙ্গলগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। কিছুদিন আগে বৈজ্ঞানিকেরা ঘোষণা করেন, মঙ্গলগ্রহে অক্সিজেনের অভাব বলে সেখানে কোন প্রকার উদ্ভিদ্ জন্মানো সম্ভব নয়। সম্প্রতি সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক জি. টি. খৎ আলমা ঘোষণা করেছেন যে, মঙ্গলগ্রহেও উদ্ভিদ্ জাতীয় বস্তু আছে। তবে, সে বস্তু আমাদের পৃথিবীর উদ্ভিদের মত নাও হোতে পারে। মঙ্গলগ্রহে মরু, সমুদ্র, তুষার-শোভিত পর্ব্বতও আছে। সেখানকার আবহাওয়া জীবনধারণের অনুকূল। এমন কি, সেখানকার বাতাসে মেঘ এবং কুয়াসার সন্ধানও তাঁরা পেয়েছেন।

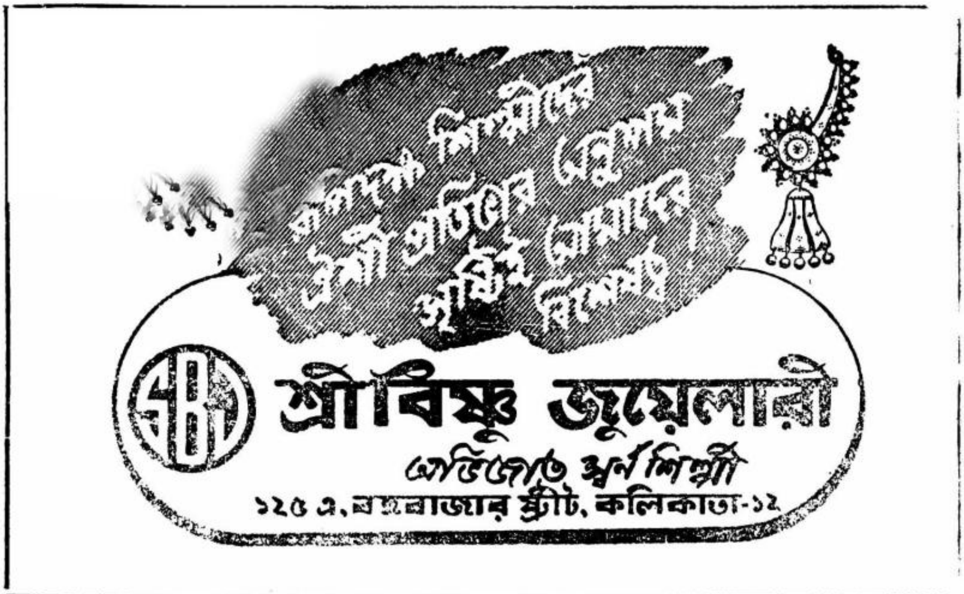

টেলি : বিদ্যাসেবা
পোঃ বক্স : ১১৪৫০

জাতির শিল্প, সংস্কৃতি ও উন্নতির মুলভিত্তি

কাগজ

ভোলানাথ পেপার হাউস্ লিঃ

হেড অফিস :—৩২এ, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা—১

ফোন :—২২-১৫৩২, ২২-১৫৩৩, ২২-১৫৩৪ (তিন লাইন)

সর্ব্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী কাগজ, বোর্ড, ছাপা কালি ইত্যাদি

ন্যায্য মুল্যে সরবরাহ করেন

ব্রাঞ্চ :—১৬৭ নং, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১৩৪।৩৫, „ „ „ „

৬৪ নং, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা   ফোন নং : বড়বাজার, ৩৪-১০২০

মফস্বল ব্রাঞ্চ :—এলাহাবাদ, পাটনা, রাঁচি ও কটক